ছবি আঁকা ছবি লেখা

হাশেম খান

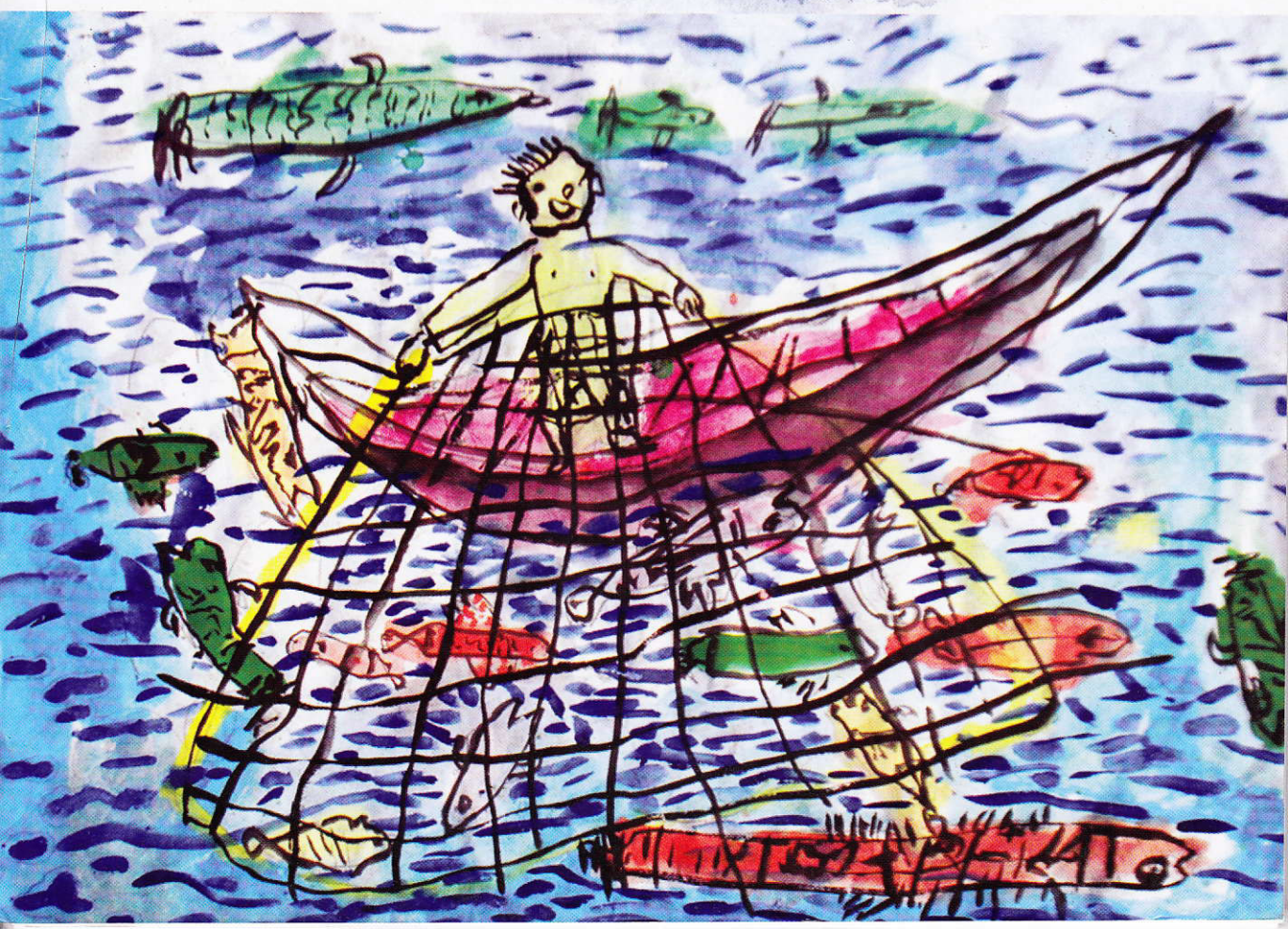

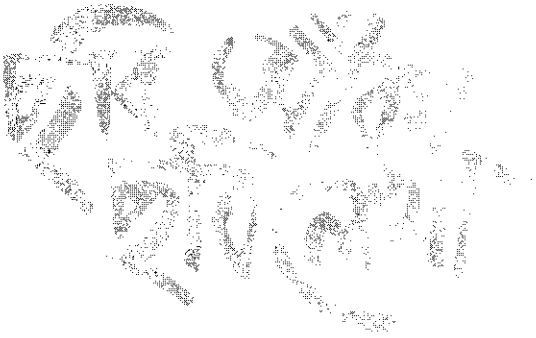

হাশেম খান

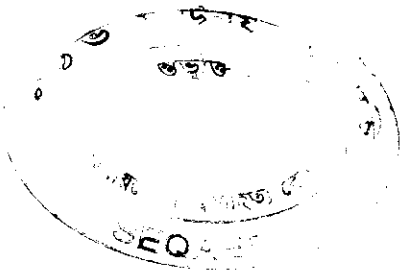

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

ছবি আঁকা ছবি লেখা ॥ হাশেম খান

শিশুদের চিত্রের আলোকচিত্র : এম এ তাহের

প্রচ্ছদের ছবি : সৈয়দ রাইয়ান হাফিজ, বয়স-৫ (২০১১)

বাশিশুএ ৭২৯

প্রকাশক : মো. নূরুজ্জামান, পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, দোয়েল চত্বর সড়ক, ঢাকা-১০০০। মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১ আরামবাগ, ঢাকা। প্রচ্ছদ ও বইনকশা : হাশেম খান। প্রকাশকাল : ভাদ্র ১৪০৮, আগস্ট ২০০১, দ্বিতীয় প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২০, মে ২০১৩।

মূল্য : ৯১.০০

CHABI ANAKA CHABI LEKHA (A Book on Drawing for Children) by HASHEM KHAN. Published by Md. Nuruzzaman, Director, Bangladesh Shishu Academy, Doyel Chattor Road, Dhaka-1000. Cover & Book-Design : Hashem Khan. Painting on the cover drawn by Syed Raiyan Hafiz, age-5 (2011). Photography of Paintings : M A Taher. Date of Publication : August 2001, Second Edition : May 2013.

Price : Tk 91.00
US$ 5.00

ISBN : 984-70076-0729-7

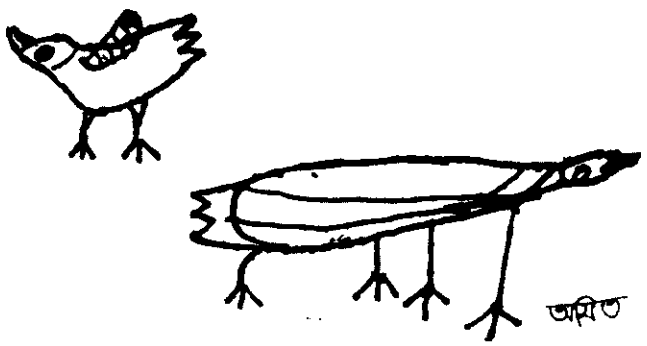

উৎসর্গ

শিশুদের প্রিয়
দুই খ্যাতিমান লেখক

আলী ইমাম
ও
লুৎফর রহমান রিটন

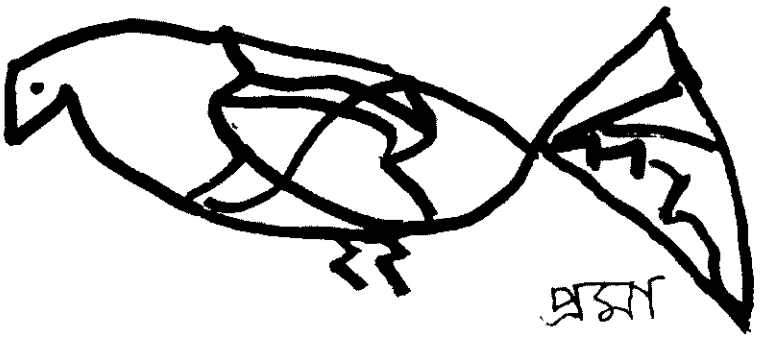

ছবি আঁকা ছবি লেখা

শিশুর অভিভাবক ও শিক্ষকদের জন্যে

বইটি শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা। তবে বড়রা অর্থাৎ বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, কাকা-কাকি, মামা-মামি, বড় ভাই, মেজো ভাই ও বোনেরা এবং শিক্ষক-অভিভাবকেরা সবাই বইটি পড়তে পারেন এবং জেনে নিতে পারেন শিশু-কিশোরদের ছবি আঁকার জন্যে কী করতে হয় আর কীভাবে ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকায় সহযোগিতা করা যায়। এই বই পড়ে শিশু-কিশোরেরাও বুঝতে পারবে কেমন ছবি তারা আঁকে এবং কত সহজে ও স্বাভাবিকভাবে ছবি আঁকা যায়।

শিশুর ছবি আঁকার রং, তুলি, কাগজ, পানি ও অন্যান্য সরঞ্জাম– বোর্ড, ক্লিপ ইত্যাদি যোগাড় করে তাদের হাতের কাছে এগিয়ে দিতে হয় বড়দের। সাধারণত তিন বছর বয়স থেকে শিশুরা ছবি আঁকতে চায় বা রং তুলি দিয়ে ঘরের মেঝে, দেয়ালে বা সামনে যা কিছু পায় তাতে আঁচড় কাটে। ওর কাছে এটা নিছক খেলা। তাই বোর্ডে কাগজ লাগিয়ে তার সামনে দিলে রং, তুলি, চক, পেন্সিল, প্যাস্টেল যা কিছু পায়– আঁচড় কেটে খেলতে খেলতে তার আঁকা ছবি ফুটে ওঠে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে শিশুর আঁকায় পরিবর্তন হয়। রেখা ধীরে ধীরে দৃঢ় হয়, রং লেপনে পারঙ্গমতা দেখা দেয়, ছবিতে বিষয়গুলো ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে, আঁকায় নানা রকম গতির প্রকাশ ঘটে। তাই শিক্ষক ও অভিভাবকেরা শিশুকে আঁকায় সহযোগিতা করার সময় তার বয়সটা মনে রেখে সে যা গ্রহণ করতে পারে তা বলতে হবে। শিশুকে আঁকার ব্যাপারে নির্দেশ– যেমন, এভাবে আঁকো, এভাবে রং লাগাও, তোমার আঁকা ঠিক হচ্ছে না, অমুকের মতো আঁকতে পারো না, এ ছবি মোটেই পুরস্কার পাবে না, আমি যেভাবে বলি সেভাবে আঁকছ না কেন– এ

ধরনের নির্দেশ কখনোই শিশুদের দেয়া যাবে না। তাদের আঁকা কাগজে কখনো এঁকে দেখানো বা তাদের আঁকা ঠিক করতে যাওয়া উচিত নয়। শিশুরা যাতে নিজে নিজেই আঁকতে উৎসাহ বোধ করে সেভাবে তাকে সহযোগিতা দিতে হয়। নিজে নিজে আঁকতে গিয়ে শিশু তার ছবিকে সুন্দর করার কলাকৌশল ধীরে ধীরে রপ্ত করে ফেলে। এভাবে তার সৃজনশীল ক্ষমতা বাড়ে, সৌন্দর্য বোধ বাড়ে, শিশু সাহসী হয়, স্বাবলম্বী হয়। এভাবে নয়-দশ বছর বয়স পর্যন্ত ছবি আঁকায় আস্থাশীল হওয়ার পর শিশু ছবি আঁকার নিয়মকানুন জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ধীরে ধীরে নিয়মকানুন রপ্ত করে– অনুশীলন করতে থাকে। এই বইতে শিশুর বয়স অনুযায়ী এবং শিশু বেড়ে ওঠার সাথে সাথে কীভাবে শিশুর আঁকায় সহযোগিতা দিতে হয়, শিশুকে উৎসাহিত করতে হয় এবং আঁকার সাধারণ নিয়মকানুন শিশু সহজেই রপ্ত করে সুন্দর ছবি আঁকতে পারে ইত্যাদি বলা হয়েছে।

এই বই পড়ে বড়রা যদি কেউ মনে করেন– ছোটবেলায় এসব বিষয় জানলে কী মজাই যে হত, তখন নিজে ছবি আঁকতে পারত, আর ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকায় নিজেকে কাজে লাগাতে পারত! তাদের জন্য বলি– কোনো বাধা নেই, কেউ আপত্তি করবে না, বড়রাও যে কোনো বয়স থেকেই ছবি আঁকা শুরু করতে পারেন। কারণ ছবি আঁকা বিষয়টা খুবই আনন্দের। সাদা কাগজে লাল নীল সবুজ বা নানা রঙে নানা রকম আঁকিবুকি করে ভরাট করে একটা কিছু (চিত্র) তৈরি করতে পারাটা সবার জন্যেই আনন্দের ও ভালো লাগার বিষয়। ছেলেমেয়ের সঙ্গে মা এবং বাবাও আঁকাআঁকি করে যেতে পারেন।

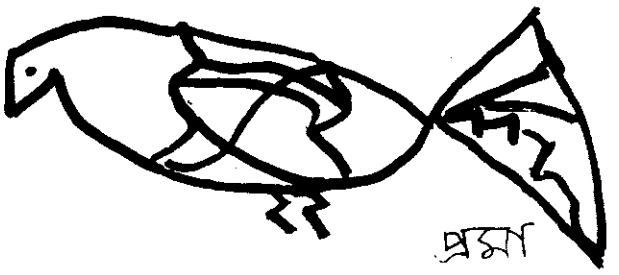

এক : দ-এর মাথাব্যথা

পাখির পেছনে ছোটা সে কি চাট্টিখানি কথা! কতক্ষণ দৌড়াব, আমি তো মাটিতে। আর পাখি ফুড়ুৎ করে আকাশে উড়ে যায়– দূরে বহু দূরে চলে যায়। সেই ছোটবেলায়, তোমাদের মতো যখন বয়স, কত যে পাখি আর পাখির বাসা খুঁজে বেড়িয়েছি। বন-বাদাড়ে ঝোপ-ঝাড়ে ঘুরে টুনটুনি, হলদে পাখি, ডাহুক, কখনো কখনো এসব পাখি ধরেও ফেলেছি। খাঁচা বানিয়ে, পোকামাকড় ধরে ওদের খাইয়ে আদর-যত্ন করে নিজের কাছে রাখার চেষ্টা করেছি। পাখির সাথে বন্ধুত্ব করার ইচ্ছেটাই ছিল প্রবল। কিন্তু বনের পাখি বনে থাকতেই পছন্দ করে। এতেই ওদের আনন্দ। মানুষের সাথে খাঁচায় বাস করতে মোটেই চায় না। তাই পাখিকে ছেড়েও দিয়েছি, বোঝাতে চেষ্টা করেছি আমি তোমাদেরই বন্ধু।

পাখির কী মজা! বাতাসে ভাসতে পারে, আকাশে উড়তে পারে। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কত সহজে ওরা চলে যায়! উঁচু থেকে দেখতে পারে বলেই একসাথে অনেক জায়গা, অনেক কিছু ওরা দেখতে পায়। কতবার ভেবেছি, আহা, পাখির মতো উড়তে পারলে কত মজা কত! অনেক কিছু একসাথে দেখতে পেতাম, সমতল থেকে এতকিছু দেখা সহজ নয়। হেঁটে হেঁটে, কাছে গিয়ে অনেক কষ্ট করে সবকিছু দেখতে হয়।

পাখির মতো উড়ে অনেক ওপর থেকে দেখতে না পারলেও কল্পনায় পাখি হতে বাধা কোথায়? চোখ বুজে একবার ভাবো তো। তুমি পাখি। উড়ে বেড়াচ্ছ আকাশে। ওপর থেকে দেখছ গাছপালা, ঘরবাড়ি, মানুষজন আরো কত কী! ভালো অনেক কিছু, আবার খারাপ কিছুও দেখা যায়। আর এভাবেই খারাপ ও ভালো পাশাপাশি দেখে মানুষ ও পরিবেশ বিষয়ে জানা সহজ হয়।

গ্রামের স্কুলে যখন পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি, আমাদের বাড়িতে ফুট-ফরমায়েশ খাটার জন্যে একটি ছেলে ছিল। ছেলেটি ছিল বেশ চটপটে ও বুদ্ধিমান। নাম আমিন। আমার থেকে বছর দুই বড়, আমার বড় ভাই, যাকে ছোট ভাইবোনেরা দাদা ডাকি, তার সমান। সে আমাকে ডাকত মধুভাই, দাদাকে দুদুভাই নামে। কাজের ফাঁকে সুযোগ পেলেই আমিন আমাদের কাছে, বিশেষ করে আমরা যখন পড়তে বসি, সেখানে চলে আসত। আমাদের বই উল্টেপাল্টে দেখত। ধীরে ধীরে জানতে পারি সে স্কুলে তিন ক্লাস পর্যন্ত পড়েছে। আমিন আমাদের বাংলা বই নিয়ে কবিতা-ছড়া পড়তে খুব পছন্দ করত। পরে অবাক হয়ে দেখি, সে নিজেও দুই লাইনে চার লাইনে সুন্দর ও মজার ছড়া বানিয়ে ফেলে। অনেক মজার মজার গল্প শোনাত আমিন। ওর নানির কাছে শোনা সব গল্প– রাজারানি, হুরপরী, ভূত-পেত্নির গল্প।

সেই আমিন একদিন আমাকে ছবি আঁকতে দেখে আমার খাতা ও পেন্সিল চেয়ে নিয়ে বলল, মধুভাই, দেহেন আঁইও একটা পইক আঁকতে হারি (আমিও একটা পাখি আঁকতে পারি)। ঝটপট কয়েক টানে সে সত্যি সত্যি একটা পাখি এঁকে ফেলল। আঁকার সঙ্গে সঙ্গে সে একটা ছড়াও পড়ে গেল। আমি অবাক। আমিনের এত গুণ! কী সুন্দর আর মজার পাখি! ছড়াটাও মজার।

দ-এর অইল মাথাব্যথা
শূন্য আইল দ্যাখতে
২২ জন কবিরাজ
পিঁড়ি দিলাম বসতে
মাথার থেইকা মারি খোঁচা
বইসা রইল পখ্‌খি প্যাঁচা।

পাখি আঁকার এই ছড়া আর ছবিটা আমার মনে গেঁথে গেল। এরপর কত বছর পেরিয়ে গেল। এক বছর, দু' বছর, তারপর অনেক অনেক দিন। আমি ছবি আঁকা শিখেছি। অনেক ছবি এঁকেছি– এখনো আঁকছি। আর পাখি? অসংখ্য পাখি এঁকেছি। নানাভাবে পাখিকে দেখার চেষ্টা করেছি। 'পাখি' আমার একটি প্রিয় বিষয়; কিন্তু সেই ছোটবেলায় আমিনের কাছে শেখা পাখিটার মতো সুন্দর পাখি আমার মনে হয় এখনো আঁকতে পারিনি।

দুই : আমিন ও কানিবক

আমিন একদিন খুবই উত্তেজিত। চোখ বড় বড় করে বলল, মধুভাই, একটা মজার জিনিস দেহাই। তারপর এদিক-সেদিক তাকিয়ে কেউ দেখে না ফেলে এমনভাবে– চুপি চুপি তার কোমরে গামছা দিয়ে বাঁধা পুঁটলি থেকে কিছু জিনিস হাতের মুঠোয় নিয়ে আমার চোখের সামনে তুলে ধরল।

আমি অবাক। দুটো ছোট আকারের ডিম। ডিমের গায়ে খয়েরি রঙের ফোঁটা ফোঁটা দাগ।

কিসের ডিমের? কোথায় পেলি? আমি জিজ্ঞেস করি।

কী জানি, মনে অয় কানিবগের ডিম। শাপলা তুলতে যাইয়া ধানক্ষেতের কোনায় হাইছি। হিয়ানো ধানগাছ আর বড় বড় লম্বা ঘাসে হাবিজাবি অইয়া রইছে। কানিবগিডা হিয়ান থেনে যহন উইড়া গেছে, মনে অয় তাইলে এগুলো বগির ডিম। আরো দেহেন, ডিম গুলানে কী সোন্দর ছবি– আর হেল্‌লাইগাই কানিবগির গায়েও এমন সোন্দর বাদামি রং।

আমিনের বর্ণনা শুনে সেদিন হেসেছিলাম।

আরেক দিন। আমার ছোট রঙের বাক্সটা মেলে ছবি আঁকছি। আমিন এসে কাছে দাঁড়াল।

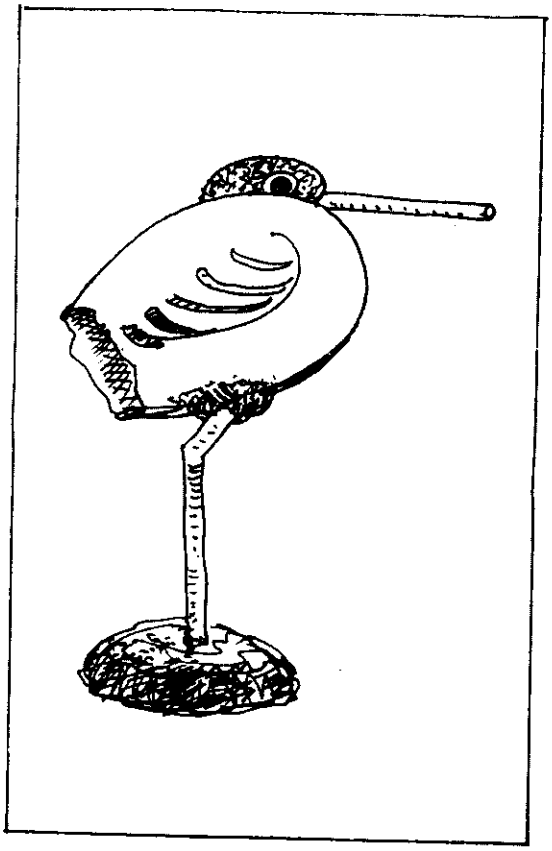

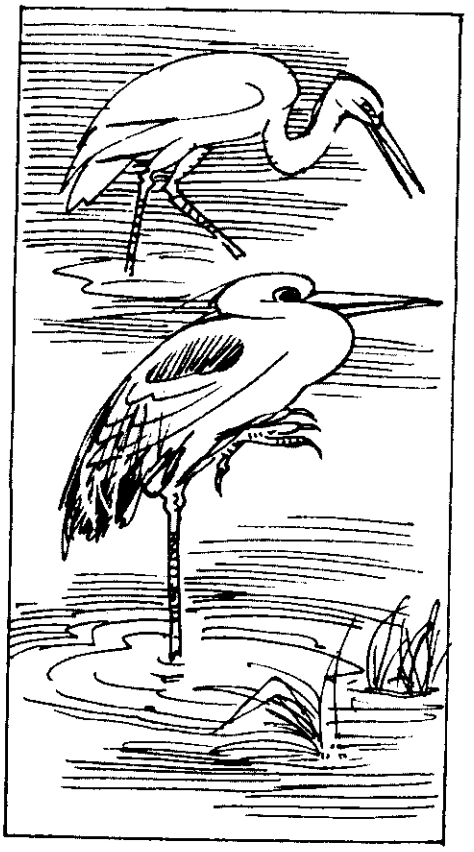

আমিনের তৈরি করা 'কানিবগ'। পাশের ছবি : কানিবগ যেভাবে এক পা তুলে দাঁড়ায়।

কী আঁকতাছেন?

তোর সেই কানিবগির ছবি।

আপনে ভালো কইরা দেখছেন, কানিবগিডা মাছ ধরার লাইগা কেমন কইরা খাড়াইয়া থায়ে? আমাগো হুইরে (পুকুরে) কানিবগিডা রোজই আইয়ে। ভালো কইরা দেইখা আঁইকেন। খাড়ান, আঁই আঁইতাছি।– বলে আমিন কোথায় যেন চলে গেল। বেশ কিছু সময় পার করে আমিন হাজির। হাতে কিছু একটা। হাসি হাসি মুখ।

বলল : এই যে দেহেন, কানিবগ।

আমি অবাক। একটা ডিমের খোলসে দুটো কাঠি আঠা দিয়ে লাগিয়ে এনেছে আমিন।

এটা কী করে কানিবগ হল?

এই যে,– বলে আমিন আমাকে বুঝিয়ে দিল।– এইডা ঠোঁট, এইডা পা, আর এই পুরা আণ্ডাডা শরীল।

একটা পা কেন? আমি জিজ্ঞেস করি।

বারে! আমনে ভালো কইরা দেইখেন। যখন বগি মাছের আশায় খাড়াইয়া থায়ে, দেখবেন এক পা তুইলা আরেক পায়ে খাড়াইয়া থায়ে। দূর থেনে তোলা পা দেহা যায় না। আর লম্বা গলাডা গুঁইজা ঘাড় মাথা এক কইরা শরীলের মধ্যে ঢুইকা থায়ে। শুধু ঠোঁটটা এরুম (এ রকম) বাইরা থায়ে। মনে হয় একটা হোলদা কাঠিতে একটা আণ্ডা খাড়াইয়া রইছে। মধুভাই, আমনে অহন ঠোঁটের মধ্যে একটু লাল রং আর পায়ে হলুদ রং লাগাইয়া দেন। গায়েও বাদামি রেখা টাইনা দেন। দেখবেন এককেরে কানিবগিডা য্যান্ খাড়াইয়া আছে।

আমিনের কাণ্ড দেখে আমার খুব মজা লাগে। ওর কথামতো রং লাগিয়ে একটা কাদার পুঁটলিতে বকের কাঠি-পা ঢুকিয়ে যখন দাঁড় করিয়ে দিলাম, তখন সত্যি সত্যি মনে হল একটা বক জলার ধারে মাছের আশায় দাঁড়িয়ে আছে।

আমিন আমাদের বাড়িতে ছিল বছর তিনেক। আমি ও আমার বড় ভাই চলে গেলাম শহরে ভালো স্কুলে পড়ব বলে। আমিনকেও ওর বাবা এসে নিয়ে গেল।

তারপর কেটে গেছে অনেক বছর। ছবি আঁকা শিখতে এসে এবং ছবি আঁকার কথা ভাবতে গিয়ে বার বার ছোটবেলার বন্ধু আমিনের কথা আমার মনে পড়ে। গাঁয়ের এক সাধারণ ছেলে আমিন সহজ সরল ভাবে যেসব কথা বলেছে সেসব কথা ছবি আঁকার ক্ষেত্রে যে অনেক প্রয়োজন তা সেদিন সবটুকু বুঝতে পারিনি। এখন দেখছি যে কোনো পাখি, পশু, মানুষ ও বস্তু আঁকতে গেলে তা দেখতে কেমন– গোলাকার, চারকোনা নাকি তিনকোনা ঘরের মতো তা ভাবতে হয়। এই যেমন কানিবকের ঝাপটি মেরে বসে থাকা– মনে হয় একটা বাদামি রঙের ডিম হলুদ কাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই যে কানিবক ডিমের মতো দেখতে– এসব ভেবে ছবি আঁকলে ছবি আঁকা সহজ মনে হয়। তাই যে কোনো বিষয়ে জানতে হলে ভালোভাবে দেখতে হয়। ছবি আঁকার প্রথম পাঠই হল ভালো করে দেখা, এবং ভালো করে দেখে বুঝে নিতে পারলেই আঁকা সহজ হয়ে যায়।

তিন : পাখি আঁকি

শুধু কানিবগি নয়, একটা মাছরাঙা পাখিও পুকুরে গেলে প্রায়ই দেখি। মাছের বাসা বানাবার জন্যে গাছের ছোট-বড় কিছু ডালপালা পুকুরের পানিতে এখানে সেখানে জড়ো করে রাখা হয়। ডালপালার দু'-একটা অংশ পানির ওপর ভেসে থাকে। মাছরাঙা সেই শুকনো ডালের ওপর চুপচাপ বসে থাকে। বসার ভঙ্গিটা বেশ মজার। মনে হয় ধ্যানে বসেছে। দুনিয়ার কোনো খোঁজখবর তার দরকার নেই।

আসলে এমন ভঙ্গি একটা কৌশল। কানিবগের মতোই। চুপচাপ বসে সে খেয়াল করে মাছের আনাগোনা। যেই মাত্র মাছের আভাস পেল অমনি ঝুপ। ঝাঁপিয়ে পড়ে লম্বা শক্ত ঠোঁটে মাছটা ধরে সেই শুকনো ডালে বা একটু দূরে নিরিবিলিতে গিয়ে ধীরে ধীরে মাছটাকে গলাধঃকরণ করে পেটে ঢুকিয়ে দেয়। মাছরাঙার মাছশিকার দেখা একটা মজার ব্যাপার। ছোটবেলায় আমি প্রায়ই দেখতাম পুকুরঘাটে বসে।

প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক। এক দল হাঁস বাচ্চাপোনাসহ রীতিমতো হইচই করে পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রায়ই দেখি এ ঘটনা। বারে বারে মাথা ডুবিয়ে, পাখা ঝাপটিয়ে, ডুব-সাঁতার দিয়ে সারা পুকুর তোলপাড়। তারপর মাছ খোঁজা। পুকুর আর পাড়ের মিলনস্থলে যেখানে পানি কম, নরম কাদা, সেখানে ঠোঁট আর মাথা গলিয়ে শামুক, গুগলি নিদেনপক্ষে ছোটখাটো মাছ বা কেঁচো পেলে ওদের দারুণ আনন্দ।

তারপর একসময় গা-টা ধুয়ে, ঘাড় বাঁকিয়ে খুঁচে খুঁচে পালক পরিষ্কার করে, গা থেকে পানি ঝরিয়ে পুকুর পাড়ে কোনো নিরিবিলি জায়গায় কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেয়া নাকি ঘুমিয়ে নেয়া– কেউ এক পায়ে দাঁড়িয়ে, কেউ পাখার নিচে মাথা ঢুকিয়ে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে– এমন দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ত।

কানিবগ, মাছরাঙা, হাঁস শুধু নয়– অনেক পাখির সাথেই পরিচয় হয়েছিল আমার ছেলেবেলায়। ডাহুক, টুনটুনি, ফিঙে, হলদেপাখি, বুলবুলি, কাদাখোঁচা, শালিক, ময়না, চড়ুই, বাবুই, দোয়েল, ঘুঘু, টিয়ে, শকুন, বাজ, কোড়া, বালিহাঁস, পানকৌড়ি এমনি আরো নাম না জানা অসংখ্য পাখি। কাক তো আমাদের সব সময়ের সঙ্গী এবং মোরগ, কবুতর বাড়িতেই পোষা হয়।

পাখির কথা ভাবতে গিয়ে, আঁকতে গিয়ে আমার ছোটবেলার বন্ধু আমিনের কথা মনে পড়ে। সেই যে একটা কানিবগ, ডিমের খোসা আর কাঠি দিয়ে কী সুন্দর বানিয়ে দিয়েছিল। আর বলেছিল ভালো করে দেখবেন, তা হলেই বুঝবেন পাখিটা দেখতে কেমন।

আর এই ভালো করে দেখতে গিয়ে, বুঝতে যেয়ে একটা ব্যাপার আবিষ্কার করে ফেলি। নিজে নিজে খুব আনন্দ অনুভব করি। তাই তো ব্যাপারটা খুব মজার।

ছোট, বড়, লম্বাটে, গোলাকার যে কোনো পাখির মূল অবয়ব ডিমের আদলে গড়া। সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী রেখা ও রং দিয়ে ইচ্ছেমতো পাখির রূপ ফুটিয়ে তোলা সহজ ব্যাপার। ডিম ফুটেই সব পাখির জন্ম। আর কী মজা! আঁকতে গিয়ে ডিমকেই অবলম্বন করে পাখির ছবি ফুটিয়ে তোলা যায়। ব্যাপারটা যেদিন প্রথম বুঝতে পেরেছি, খুবই উত্তেজনা অনুভব করেছি, আনন্দ পেয়েছি।

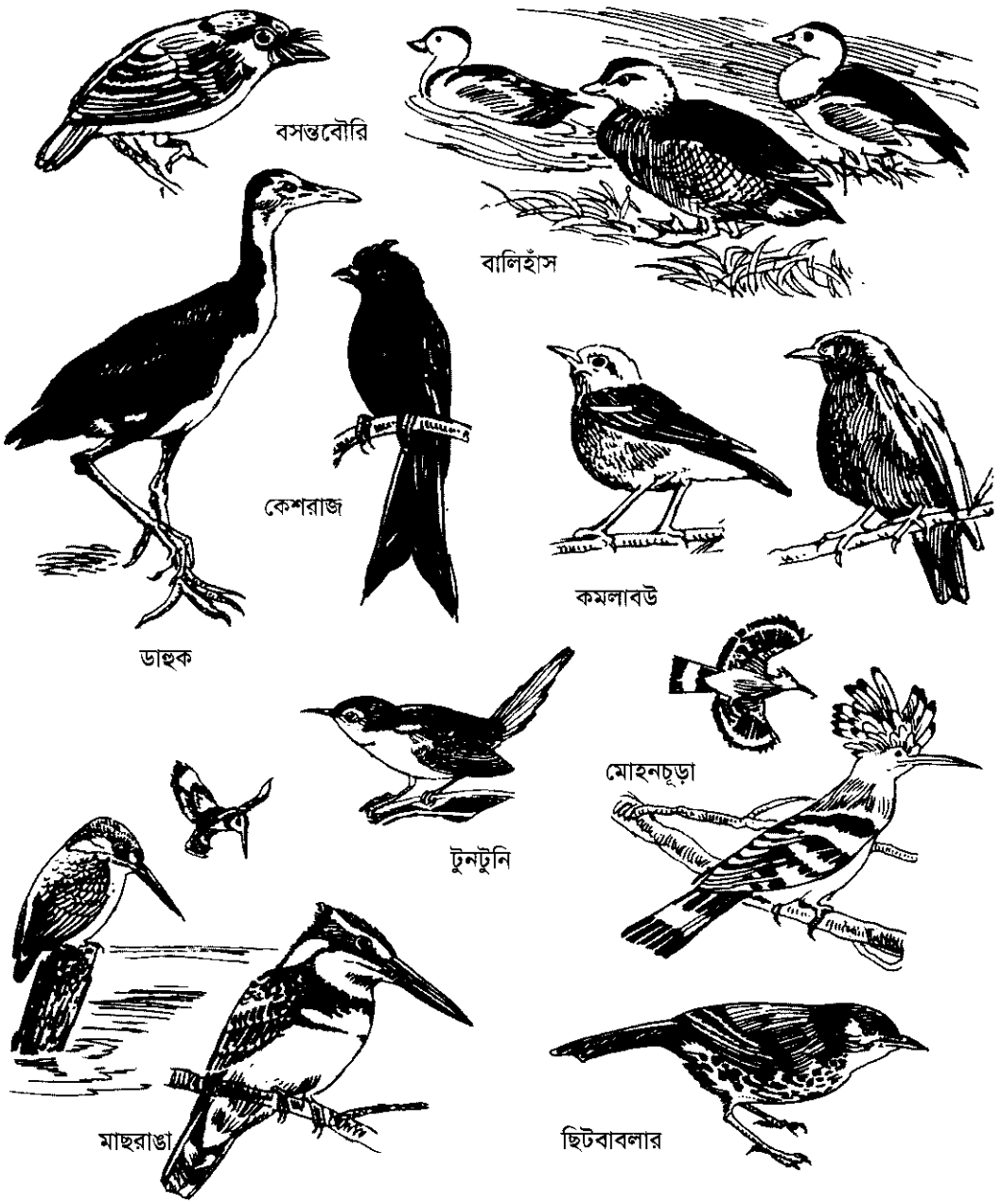

বাংলাদেশের দশটি পাখি। নানা রকম ভাবে বসে আছে। যদিও পাখিগুলো আনুপাতিক মাপে এখানে আঁকা হয়নি। ডিম এঁকে, তারপর যে কোনো পাখি যে কোনো ভঙ্গিতে আঁকা যায়।

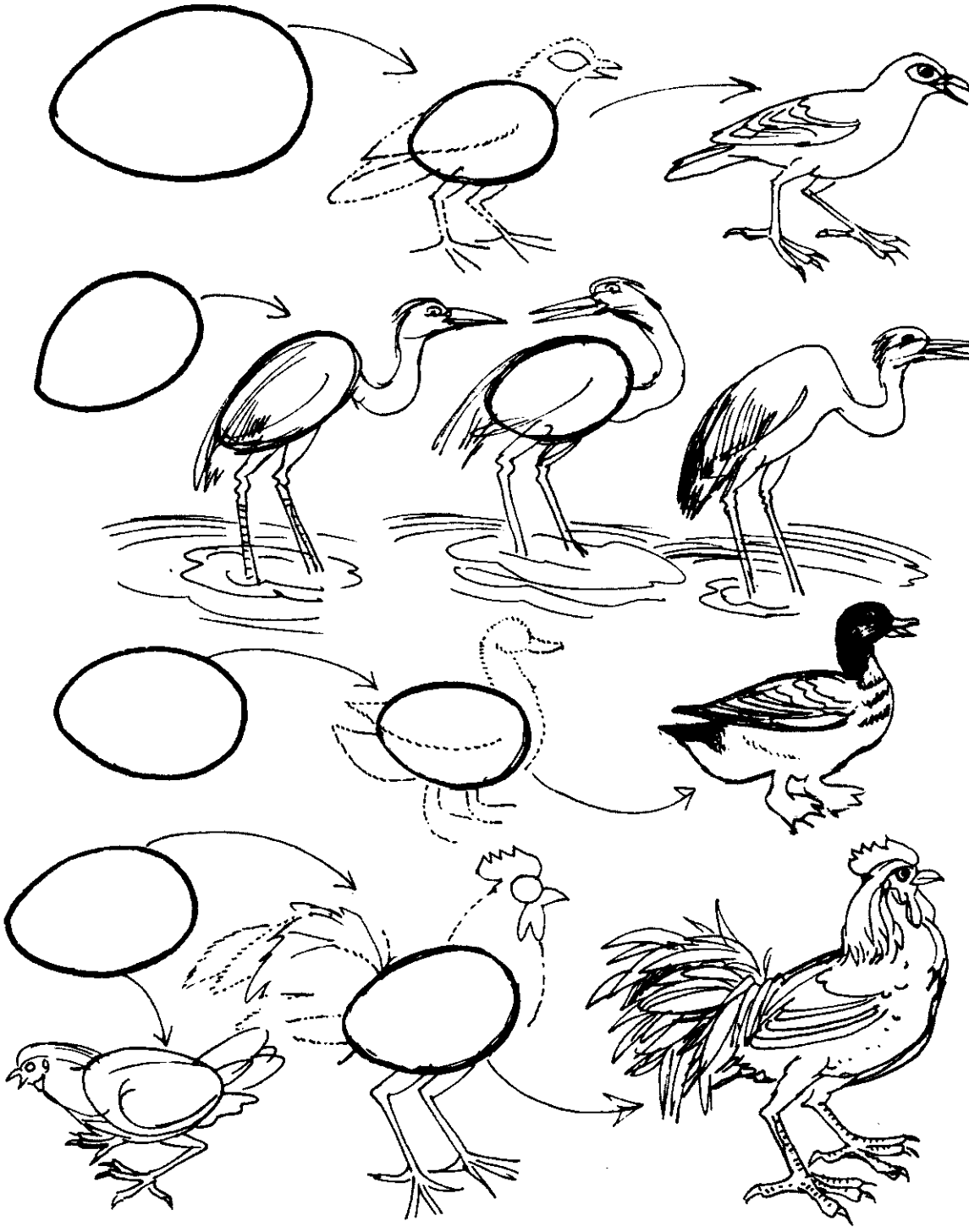

ডিম ফুটেই সব পাখির জন্ম হয়। আবার কী মজা– ডিম আঁকার পর থেকে যে কোনো পাখির ছবি সহজেই আঁকা যায়।

শিশু অমিতের আঁকা পাখি - বয়স ৭

উল্লেখ করা ছবিগুলো লক্ষ করলেই পাখি আঁকার সহজ নিয়মটা বোঝা যায়। তবে এটাই যে একমাত্র নিয়ম তা কিন্তু নয়। শিল্পী তার বোধ, বুদ্ধি ও অনুভবকে যে ভাবে বা নিয়মে সম্ভব হবে ফুটিয়ে তুলবে। একটা কথা এখানে মনে রাখা ভালো, বয়সে যারা খুব ছোট– যাদের বয়স পাঁচ থেকে আট-নয় পর্যন্ত, তারা ছবি আঁকার এতসব নিয়মকানুন ও ব্যাকরণ মানার প্রয়োজন বোধ করে না। ছোটরা কী করে? ইচ্ছেমতো রং দিয়ে তাদের ছবি ভরিয়ে তোলে। বাস্তবে যেসব জিনিস– মানুষ, পশুপাখি, প্রকৃতি ইত্যাদির ছবি আঁকলেও তা মেলাতে গেলে শিশুর ছবির সঙ্গে হুবহু মিলবে না। কিন্তু বস্তুসামগ্রী চিনতে বা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না। ক্ষুদে শিল্পীরা বাস্তবের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করে না। বরং বাস্তব সম্পর্কে সে যা জানে তার ধারণা ও বোধকে তার কল্পনার সঙ্গে মিশেল দিয়ে সে আঁকে। রং-রেখার ব্যবহার খুব সহজ ও সাবলীল। কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তার মধ্যে নেই। সাহসের সঙ্গে সে সবকিছু প্রকাশ করে। ফলে শিশুর ছবি হয়ে ওঠে অভিনব ও প্রাণবন্ত– যা দেখে আমাদের মন আনন্দে ভরে যায়। ছোট-বড় সবাই আনন্দের সঙ্গে ক্ষুদে শিল্পীদের মতো আঁকার চেষ্টা করে। শিশুদের মতো সহজ ও সাবলীল হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তা কতখানি সম্ভব?

আগেই বলা হয়েছে ছবি আঁকার প্রথম পাঠ 'দেখা'। ভালো করে দেখে নেয়া। চারপাশটা ভালো করে দেখতে হয়। দেখা শুধু চোখের দেখা নয়। ভালো করে বুঝে নেয়া। গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ, মাঠঘাট, নদীনালা, আকাশ-বাতাস, পরিবেশ। সবকিছু সম্পর্কে

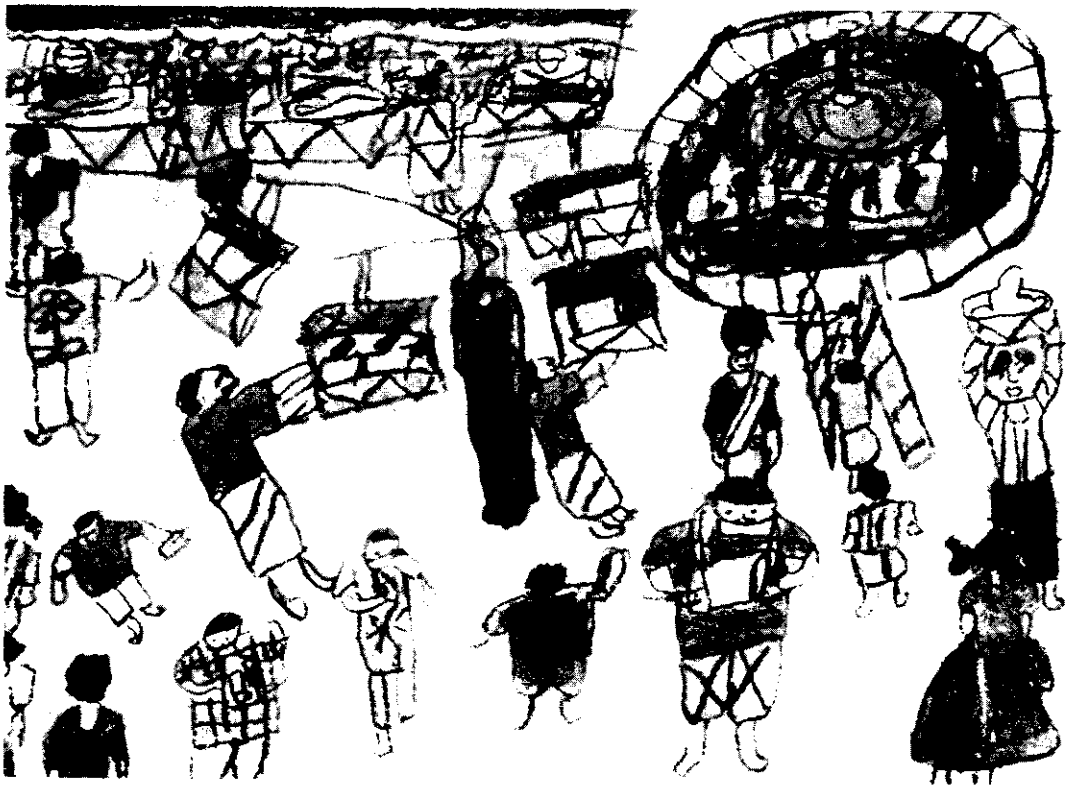

মো. শাহিনুর রহমান শাহিনের আঁকা শিশুপার্ক - বয়স ৮

নিজের বোধশক্তি বা ধারণা ও জ্ঞান বাড়াতে হয়। ভালোভাবে দেখার মধ্য দিয়ে যারা নিজের চিন্তাশক্তি ও কল্পনার প্রখরতাকে বাড়াতে পারে, তারাই ছবি আঁকতে পারে।

যে বয়সে ছবি আঁকার নিয়মকানুন বুঝতে পারে, তখনই নিয়মমাফিক শুদ্ধ ড্রইং শেখার চেষ্টা করতে হয়। সাধারণত ১০ বছর বয়স থেকে কিছু কিছু করে নিয়মকানুন রপ্ত করা ভালো। কথাটা এজন্যেই বলা হচ্ছে যে ক্ষুদে শিল্পীদের খুব ছোটবেলায় ছবি আঁকার বেশি নিয়মকানুনের বোঝা চাপিয়ে দেয়া ঠিক নয়। শিশুর বয়স ও তার গ্রহণ করার ক্ষমতা বিবেচনা করে তাকে আঁকার বিষয়ে বয়স্ক লোকেরা সাহায্য ও সহযোগিতা করতে পারেন। অর্থাৎ রং তুলি কাগজ ইত্যাদি যোগাড় করে দেয়া এবং সেগুলো কীভাবে যথাযথ ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে সাধারণ কিছু ধারণা দেয়া যেতে পারে।

এখানে বলে রাখা ভালো, তিন-চার বছর বয়স থেকে শুরু করে আট-নয় বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ছবি আঁকা শেখানোর পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। ওরা যে যেভাবে আঁকে, যে যেভাবে ভাবে, সেটাকেই উৎসাহিত করে এগিয়ে নিতে হয়। তার সঙ্গে সায় দিয়ে দিয়ে, গল্প করে করে, সে যা আঁকছে সেটাই সুন্দর সেটাই ঠিক ইত্যাদি বলে আরো কিছু

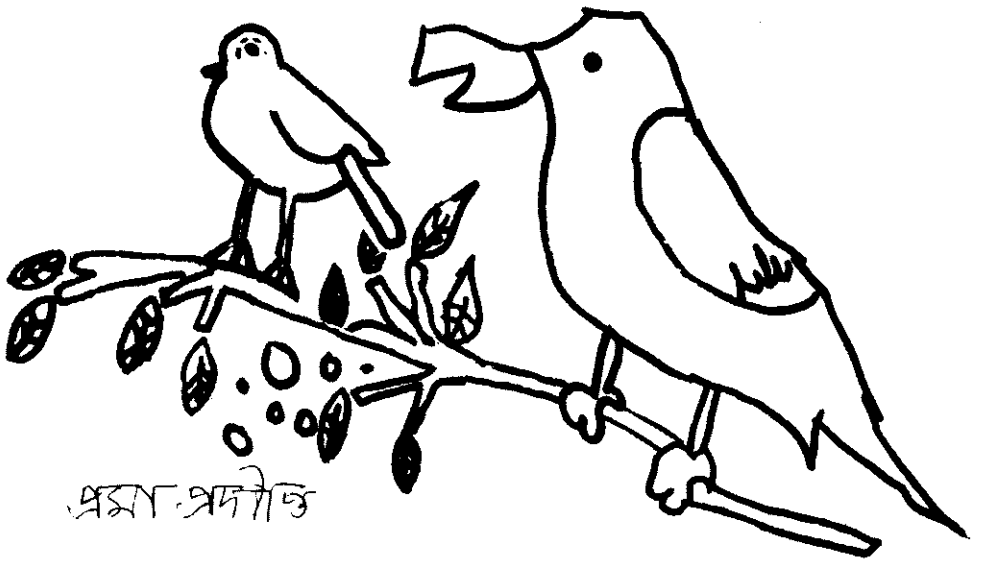

'টিয়া ও চড়ুই'। এঁকেছে প্রমা প্রদীপ্তি - বয়স ৭

সংযোজন করবে কিনা, আরো কিছু রঙ বেশি করে দেবে কিনা– নানাভাবে গল্প করে, তার আঁকার প্রশংসা করে তাকে আনন্দ দিতে হয়। কখনোই বলা উচিত নয়– তোমার এ রঙটা ঠিক হয়নি, তোমার গরুটা তো গরুর মতো হল না। পাখির পা-টা ছোট কেন? বরং বলতে হবে– এ গরুটার শিং চোখালো হলেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই, তাই না? গরুটা খুব ভালো। তোমার পাখিটা কী খায়? এ পাখিটা পোকামাকড়, কাঁচামাছ এসব খেলেও টফি চকলেট পেলে খুব খুশি হবে, তাই না? এমনি ধরনের গল্প করতে হবে। যদি দেখা যায় কোনো ক্ষুদে শিল্পীর কাগজটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে, রং ভালোভাবে দিতে হয়তো ভয় পাচ্ছে, তখন তার ছবি দেখে বলা যেতে পারে– তাইতো, তুমি বুঝি রং কম দিয়ে আঁকতে পছন্দ করো? ইস, আমি যদি তোমার মতো ভালো আঁকতে পারতাম, ইচ্ছেমতো রং দিতাম। এখানে লাল, এখানে নীল– আরো কত রং দিতাম! কারণ বেশিরভাগ লোকই রঙের ছবি খুব পছন্দ করে।

অর্থাৎ শিশুদের বয়স বিবেচনা করে তাদের সঙ্গে খেলার ছলে, গল্পগুজব করে ছবি আঁকায় বড়দের হাত লাগাতে নেই।

হ্যাঁ, আবার পাখির গল্পে ফিরে যাওয়া যাক।

পাখির আকার-আকৃতি জেনে শুদ্ধ ড্রইং করার নিয়ম জানলেই শেষ হল না। পাখির স্বভাব, বিশেষ বিশেষ পাখির ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য, ওড়ার ভঙ্গি, ছুটে পালাবার ভঙ্গি, শিকার করার ভঙ্গি এবং বাহারি পালক, গায়ের রং ইত্যাদি বিষয়ে ভালো করে জেনে নেয়া প্রয়োজন। তা হলে শিল্পী সঠিকভাবে পাখির ছবি আঁকতে পারবে।

চার : মদির কাকের ছবি

"কাক। কাক কা-কা করে ডাকে। কথা বলে, গান গায়। কাক পাখি হিসেবে খুব সুন্দর। গায়ের পালক নানা রঙের। লাল নীল সবুজ হলুদ সাদা গোলাপি বেগুনি এমনি হরেক রকম রঙের নরম পালকে মোড়া কাক-পাখি। পা একদম হলুদ। ঠোঁট লাল আর চোখ দুটো নীল-কালো। এমন একটি কাক আমার পোষার খুব ইচ্ছে। হাতের কাছে পেলে তাকে খুব আদর করতাম। ভাত খাওয়াতাম, কলা খাওয়াতাম, দুধ, মাছ সব খাওয়াতাম। কিন্তু কোথায় পাই এমন একটা কাক?"

বছর দশেকের একটি গ্রামের মেয়ে অনেক অনেক দিন আগে ওপরের বর্ণনা মতো একটি কাকের ছবি এঁকেছিল। না, রং-তুলি দিয়ে কাগজে আঁকেনি। যখনকার কথা সে সময় রং-তুলি– এসব পাওয়ার কথাই নয়, তারপর অজ পাড়া-গাঁ। ওপরের মতো করে গোটা গোটা অক্ষরে শ্লেটে লিখেছিল– কাকের এক বাহারি ছবি।

মেয়েটির নাম মদিনা বানু, সংক্ষেপে সবাই ডাকে মদি। একটু চুপচাপ ও সরল স্বভাবের মেয়ে। ক্লাসের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের তুলনায় শান্ত।

সেকদী গাঁয়ের মুন্সীবাড়ি প্রাইমারি স্কুল। সারা গাঁয়ে এই একটিমাত্র স্কুল। এই স্কুলের চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ি আমি। আজ থেকে অনেক বছর আগের ঘটনা। ১৯৪৯ সাল। মদির মতো আরো পাঁচটি মেয়ে পড়ত আমার সাথে। ছেলে ছিলাম নয় জনের মতো। সব ক'টি মেয়ের সাথেই আমার বন্ধুত্ব ও সখ্য ছিল। তবে চারটি মেয়ের সাথেই ছিল বেশি। ওদের নাম আজও ভুলিনি। শামছি, দেলু, রোশন ও মদি। ছেলেদের মধ্যে মান্নান, সালাউদ্দিন ও টুনু।

বাংলা রচনা লিখতে দিয়েছিলেন মাস্টার সাব। শিক্ষকদের এখনকার মতো 'স্যার' বলার নিয়ম ছিল না। 'মাস্টর সাব' বা 'মাস্টার সাব' আমরা বলতাম। হেডমাস্টার, সেকেন্ড মাস্টার ও ছোট পণ্ডিত সাব– এই তিন জন মাস্টার ছিলেন আমাদের পড়াবার জন্যে।

সেদিন কাক বিষয়ে রচনা লিখতে দিয়েছিলেন হেডমাস্টার সাব। এর আগে গরু ও কুকুর নিয়ে রচনা লিখেছি। একটা স্লেটের দু' পিঠে যতটুকু ধরে তা লিখে একে একে মাস্টার সাবকে পড়ে শোনাতে হত। পরে সব জমা দিলে তিনি বানান ও হাতের লেখা ঠিক করে দিতেন। আজকের মতো খাতায় লেখার তখন প্রচলন ছিল না। পঞ্চম-ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে খাতায় লেখার অভ্যাস হত।

কয়েক জন রচনা পড়ে শোনাবার পর মদির পালা এল। মদি দু'-তিনটি লাইন পড়ার পর আমরা সবাই অবাক। মাস্টার সাবও ভুরু কুঁচকে স্থির দৃষ্টিতে মদির দিকে তাকিয়ে শুনতে লাগলেন। আমরা দু'-চার জন মদির পড়া শুনে হাসি চাপতে না পেরে অদ্ভুত শব্দ করে উঠি, কিন্তু পরক্ষণেই আবার মাস্টার সাবের চাহনি দেখে স্থির হয়ে গেলাম। মদি না থেমে একনাগাড়ে গড়গড় করে তার রচনা 'কাক' পড়া শেষ করল।

এতক্ষণের চাপা হাসি আর চাপতে না পেরে ফিকফিক ফাঁক ফোঁক ফিস– নানা শব্দে ক্লাসময় ছড়িয়ে পড়ল। মাস্টার সাব সারা ক্লাসে চোখ বুলিয়ে হাতের বেতটা তুলে টেবিলের ওপর সপাং করে একটা বাড়ি মেরে প্রায় হুঙ্কার দিলেন– এই সব চুপ। হাসি পাচ্ছে, না?

মুহূর্তে সব চুপ। ভয়ে চমকে উঠলাম আমরা। মদিও ভড়কে গিয়ে কুঁচকে গেল। দু' হাতে স্লেটটা বুকে চেপে দাঁড়িয়ে রইল।

মাস্টার সাব বেশ জোরে শব্দ করে ডাকলেন– আয়, স্লেটটা নিয়ে আয়।

লাল রঙের শাড়ি পরা মদি ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গিয়ে মাস্টার সাবের সামনে দাঁড়াল। মাস্টার সাব স্লেটটা হাতে নিয়ে একটু উল্টেপাল্টে দেখলেন। তারপর ধমকে বললেন– কাউয়ার গায়ে লাল-নীল পালক– বাহ! কী সোন্দর কথা। কোথায় দেখলি কালা কাউয়ার গায়ে এত রং? লেখাপড়াডারে একটি খেলা পাইচস্ নাহ।

আমরা ভাবলাম এবার সপাং সপাং কয়েক ঘা বেত পড়বে। মদি ভয়ে জড়সড়। মুখে কোনো কথা নেই।

না, মাস্টার সাব বেত তুললেন না। ধমকে বললেন– যা, বাইরে গিয়ে মাঠের মাঝখানে রইদে খাড়াইয়া থাক। তাইলে বুঝবি কাউয়া কালা না ধলা– লাল নীল হলুদ সবুজ– কত রঙের। খাড়াইয়া খাড়াইয়া ভালো কইরা কাউয়া দেখ। ছুটির পরে আবার কাউয়ার রচনা লেইখ্যা দিয়া যাবি।

এ রকম শাস্তি আমাদের সবার কপালে প্রায়ই জুটত। তবে মেয়েদের বেলায় মাফ হয়ে যেত। তাদের দু' ঘা বেত মেরে শাস্তি মওকুফ করে সবার সাথেই ছুটি দেয়া হত। তা না হলে মাস্টার সাবদেরই উল্টো শাস্তি– মেয়েদের বাড়ি পৌঁছে দিতে হত।

ভাদ্র মাসের রোদ। অনেকক্ষণ তাতানো রোদে ভ্যাপসা গরমে বেচারি মদি ঘেমে নেয়ে অস্থির। তার নরম দুটো গাল রোদে লাল– চোখ থেকে পানি ঝরছে অনবরত। আমার খুবই খারাপ লাগতে লাগল। যদিও ওর 'কাকের রচনা' শুনে সবার সাথে আমিও হেসেছি।

অনেক পরে মাস্টার সাবের দয়া হল। মদি তখন আর দাঁড়াতে পারছে না। বারান্দায় এসে খুঁটি ধরে বসে পড়ল। মাস্টার সাব তবুও ছাড়লেন না। বললেন– এই বারান্দায় মাটিতে বইয়া রচনাডা ঠিকমতো লেইখ্যা দিয়া যা।

এরপর কাকের কী রচনা লিখেছিল মদি তা আর জানা হয়নি। তবে রোদে দাঁড়াতে তার যে প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হয়েছিল এবং সে যে খুব কেঁদেছিল তা দেখে আমার মনেও কষ্ট হয়েছিল। বাড়িতে ফিরে বার বার ওর কথা মনে হয়েছে। কেন সে কাককে এত রংচঙে দেখল। আবার সেটা বানিয়ে বানিয়ে লিখল। মাস্টার সাবের বেতের কথাও সে ভাবল না। আহা, রোদে দাঁড়িয়ে কী কষ্টই না পেয়েছে!

মদির কথা ভাবতে ভাবতে কখন দেখি মদির ভাবনার কাক আমারও মনে ধরেছে। তাই তো, এমন একটা নানান রঙের কাক যদি পাওয়া যেত, কী মজাই না হত!

সন্ধ্যার পড়া শেষ করে রাতে শোবার আগে হারিকেনের আলোর নিচে বসে বাংলা হাতের লেখার খাতায় মদির কল্পনা অনুযায়ী একটা কাক আঁকলাম। আমি তখন লুকিয়ে লুকিয়ে এক-আধটুকু ছবি আঁকার চেষ্টা করি। কিন্তু তখন আমার কাছে রং-তুলি এসব কিস্‌সু নেই। সম্বল একটা লাল ও নীল পেন্সিল। একটা পেন্সিলে এক ভাগ লাল আরেক ভাগ নীল। এই লাল ও নীল দিয়েই ঘষে ঘষে একটা রঙিন কাক আঁকলাম। তারপর খুব যত্ন করে খাতা থেকে ছিঁড়ে বইয়ের ভাঁজে রেখে দিলাম।

পরদিন স্কুলে ছেলেমেয়েরা মদিকে আরো খেপাল।– এই যে মদি, তোর লাল নীল হলুদ বেগুনি কাউয়াডারে কী খাওয়াইছস্। দুধ না পোলাও? হি-হি-হি। কাউয়াডা কথা কয়, গান গায়?– ইত্যাদি বলে বলে।

ঠাট্টা-মশকরায় মদির মনটা আরো খারাপ হয়ে যায়। চুপচাপ হয়ে যায়। কারো সাথে তার কথাবার্তা নেই। খেলাধুলা দৌড়ঝাঁপ থেকে সেদিন সে দূরে। ওকে সান্ত্বনা দেয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকি। ক্লাসের বন্ধুদের বারণ করি, আর যেন ওকে ঠাট্টা না করে।

স্কুল ছুটির পর যে যার বাড়ির দিকে ছুটতে শুরু করল। মদিও ওদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করেছে। আমি দ্রুত এগিয়ে ওর পাশে যাই। ও খানিকটা অবাক। কারণ আমার বাড়ির পথ উল্টোদিকে।

তাড়াতাড়ি বইয়ের ভাঁজ থেকে আমার আঁকা লাল ও নীল রঙের কাকের ছবিটা ওর হাতে দিয়ে বলি, মদি এই দ্যাখ একটা রঙিন কাউয়ার ছবি, আমি তোর জন্যে আঁইক্যা নিয়া আইছি।

মদি ছবিটা একনজর দেখল। তারপর খুবই রেগে আমার দিকে তাকিয়ে ছবিটা দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিয়ে দমাদম কয়েকটা কিল-চাপড় মেরে হন হন করে বাড়ির দিকে চলল।

আমি হতভম্ব। সেই মুহূর্তে অস্ফুটস্বরে কী বলেছিলাম, তা আর এতদিন পরে মনে নেই। তবে 'মদি, তোর ভালো লাগার জন্যে তোর মতো করে আমি ছবিটা আঁকছি'– এই ধরনের কিছু একটা মনে হয় বলেছিলাম।

ধীরে ধীরে বাড়ির দিকে– উল্টোপথে পা বাড়ালাম। হঠাৎ পেছন থেকে আমার নাম ধরে ডাক– মধু শোন।

পেছনে ফিরে দেখি মদি আমার আঁকা দুমড়ানো ছবিটা খুব যত্নে মেলে ধরে হেসে ফেলল। তারপর ভাঁজ করে তার বইয়ের ফাঁকে রেখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খুব সুন্দর। তারপর একছুটে বাড়ির দিকে পালাল।

পরে একদিন মদিকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা তুই কাউয়ার রচনা এমনভাবে লিখলি কেন? মদি যা বলল– আমাগো রসুই ঘরে (রান্নাঘর) কিস্‌সু রাহন যায় না কাউয়ার জ্বালায়। হেল্লাইগা বাবা একদিন একটা কাউয়ার বাচ্চা পাইয়া ডানা দুইটা ভাইঙ্গা উঠানে বেলগাছের উঁচা ডাইলে বাইন্দা রাখছে। যাতে ভয়ে আর কাউয়া না আইয়ে। কাউয়ার বাচ্চাডা যা কাঁনছে– ক্যা ক্যা কইরা। আমার খুব খারাপ লাগছে। বাবারে এত কইলাম, বাবা বাচ্চাডার ডানা ভাইঙ্গেন না, বাচ্চাডা ছাইড়া দ্যান। বাবা হুনল না। তারপর কাউয়ার মা, বাবা, ভাই, চাচা, জ্যাডা– পঁচিশ-তিরিশিটা কাউয়া কী যে চিৎকার– কা কা কা হুলস্থুল কাণ্ড। মা ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া বাবারে কইল, কাউয়ার বাচ্চাডারে দূরে কোনোহানে নিয়া ফালাইয়া দ্যান। নইলে কাউয়ার চিৎকারে বাড়িত থাওন যাইব না। তারপর বাবা কাউয়াডারে দূরে ফিক্‌কা ফালাইয়া দেয়। পরে আমি গিয়া দেহি বাচ্চাডা মইরা গ্যাছে। বাচ্চাডার জন্য আমার খুব কষ্ট অইছে, চোখে পানি আইয়া গেছিল।

রাতে ঘুমানোর পর দেহি– কাউয়াডা আমার কাছে আইয়া হাজির। কইল, তুমি খুব ভালো মাইয়া, তাই তোমার কাছে আইছি। কিন্তুক তহন কাউয়াডা মোটেই কালো রঙের না। লাল, নীল, হলুদ, বেগুনি নানা রকমের নরম পালক। ঠোঁটটা কী সুন্দর টুকটুকে লাল! কা কা কা করে কী সুন্দরভাবে আমার লগে কতা কইল! তারপর মার ডাকাডাকিতে ঘুম ভাইঙ্গা গেল। দেহি ভোর অইয়া গ্যাছে। হেদিনই তো স্কুলে মাস্টার সাব আমাগো কাউয়া দিয়া রচনা লেখতে কইল। আমার সেই স্বপ্নে দেখা সুন্দর কাউয়ার কথা মনে অইতেই হেডা লেইখ্যা দিলাম।

এরপর অনেক অনেক দিন পার হয়ে গেছে। আমি প্রাইমারি স্কুল থেকে ভর্তি হয়েছি গ্রামের হাই স্কুলে, সেখান থেকে শহরে, তারপর ঢাকায় আর্ট কলেজে ছবি আঁকা শিখেছি, চারুকলায় শিক্ষকতায় যোগ দিয়েছি। কত বছর পার হয়ে গেছে। ছোটবেলার বন্ধু মদির কথা অনেক দিন ভুলেই ছিলাম।

ছবি আঁকার জগতে এসে বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের ছবি আঁকার জগতে যেয়ে দেখি– আরে, আমরা বাইরে থেকে কোনো বস্তু, পাখি, মানুষ ইত্যাদি যা-ই দেখি

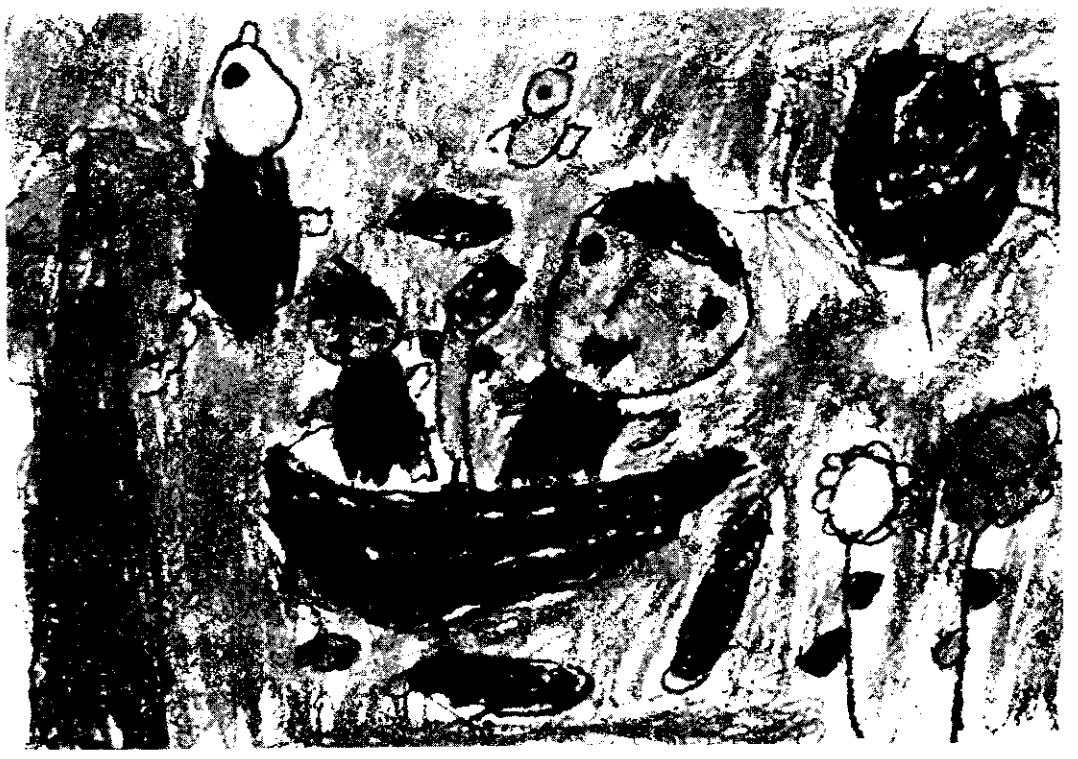

শিশু সামিয়া সালাহউদ্দিনের আঁকা ছবি - বয়স ৪

সেটাই শেষ দেখা নয়। বাইরের একটা রূপ আছে বটে, কিন্তু ভেতরে যে রূপ আছে সেটাও তো দেখতে হয়। সেটা দেখতে হলে মনটা তৈরি করতে হয়। ভাবতে হয়। মনের চোখ দিয়ে দেখে অনুভব করতে হয়। মনের চোখ দিয়ে দেখা রূপ ও বাইরের দেখা রূপ দুটোকে একাকার করে রং-রেখায় আঁকতে পারলেই সত্যিকারের সুন্দর ছবি হয়ে ওঠে, যাকে বলে 'শিল্প'। শিশু-কিশোরদের আঁকা ছবিতে এই শিল্পরূপ খুব সহজেই চোখে পড়ে। শিশুরা যে সুন্দর ছবি আঁকে, সে রকম স্বাভাবিক সুন্দর ছবি বড়রা আঁকতে পারে না।

ছোটবেলায় আমার স্কুল সহপাঠী মদি, কাককে নিয়ে যার অন্যরকম চিন্তা, যা সে স্লেটে লিখেছিল, সেদিন যদি তার হাতে রং-তুলি তুলে দেয়া যেত, তার কল্পনাকে একটা রূপ দিতে পারত। সুন্দর একটা কাকের ছবি এঁকে সবাইকে অবাক করে দিতে পারত।

জানি না মদি আজ কোথায় আছে। ছোটবেলার কাক নিয়ে ঘটনাটা আজ আমার ছবি আঁকা, শিল্প নিয়ে চিন্তাভাবনায় দারুণভাবে নাড়া দিচ্ছে। মদিকে মনে পড়ছে বার বার। সেই ছোটবেলার মতো করে সুন্দর একটা কাক আঁকার অনেক চেষ্টা করেছি, পারিনি। কারণ ছোটবেলার মতো ছবি বড় হয়ে আঁকা খুবই কঠিন। সে রকম সুন্দর হয় না।

পাঁচ : ওরা তিন জন

ওরা তিন জন। তিন ঘর। ওদের নাম গোল ঘর, চারকোনা ঘর ও তিনকোনা ঘর।

ওদের তিন ঘরের এক বন্ধু আছে। তার নাম রেখা। রেখার কোনো ঘর নেই। ঘরের প্রয়োজনই নেই। কারণ রেখার ঘর ওই তিনের মধ্যেই। একটু খুলেই বলা যাক। রেখাকে বাদ দিয়ে ওই তিন ঘরের কোনো ঘরই তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই রেখা তিন ঘরের সব সময়ের সঙ্গী। নিচের ছবিগুলো দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারা যায়।

রেখা আরো অনেক ঘরই বানাতে পারে। ইচ্ছেমতো নানা রকম। অনেক রূপ সেসব ঘরের।

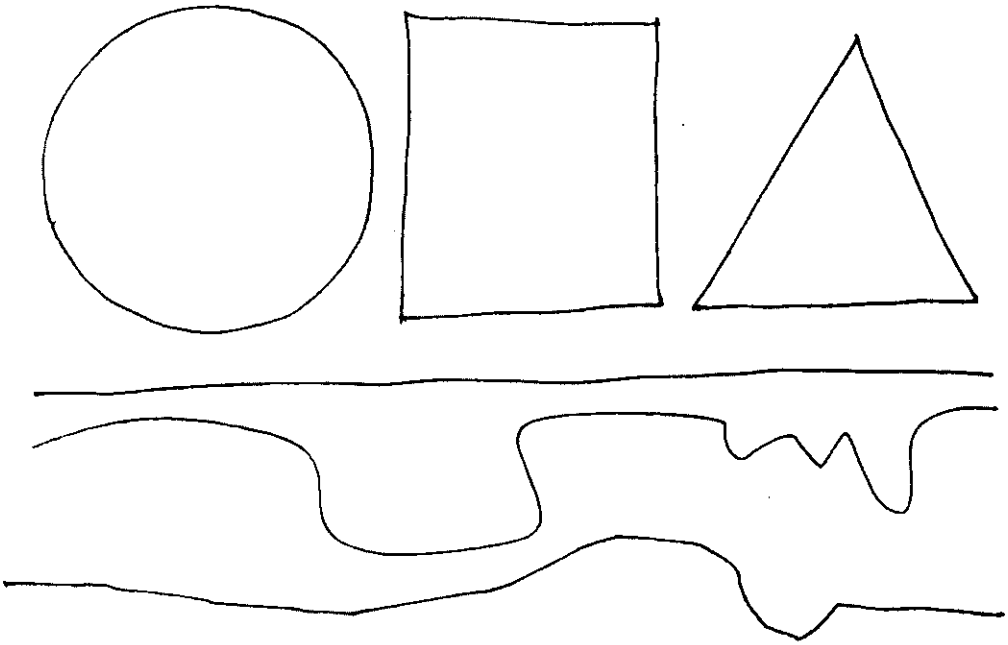

ছবি আঁকতে চাইলে, তা যে কোনো ছবি, প্রথমে ড্রইং করতে হয়। আর ড্রইং করতে হলে একমাত্র ভরসা রেখা। তাই 'রেখা' বা লাইন ছবি আঁকার জন্যে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয়। আর 'রেখা' ছবি আঁকার সুবিধা করে দেয়ার জন্যে কী-না করেছে? ওই যে উপরের তিনটি ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। প্রকৃতিতে এবং চোখের সামনে যেসব বস্তু, মানুষ, গাছপালা ও ঘরবাড়ি, সেগুলো ড্রইং করতে হলে ওই তিনটি ঘরের খুবই প্রয়োজন। ওই তিনটি ঘরেই বন্দি হয়ে আছে দুনিয়ার সব জিনিস।

রাস্তার মোড়ে যে বিরাট বটগাছ তা একটু ভালো করে দেখা যাক। গোল আকারের সঙ্গে কত মিল। এমনিভাবে সব গাছই গোল আকারের সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ঘরবাড়ি, দালানকোঠার মিল রয়েছে চতুর্ভুজ ও ত্রিভুজের সঙ্গে বা চারকোনা ও তিনকোনা ঘরের সঙ্গে।

যে কোনো ফুল আঁকার জন্য ড্রইং করতে প্রথমে দেখতে হয় কোন আকারের সঙ্গে মিল। ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে প্রায় সব ফুলই কোনো না কোনোভাবে গোল আকারের। এমনি করে যে কোনো বস্তু, পশুপাখি, গাছপালা আঁকার শুরুতে তার আকৃতি বা রূপটা ভালো করে দেখে বুঝতে হয়– সেটা গোলাকার নাকি চতুর্ভুজ বা চারকোনা, ত্রিভুজাকৃতি বা তিনকোনা ঘরের আদলে গড়া। আদল বা রূপ বুঝে নিয়ে প্রথমে আকৃতিগত কাঠামো এঁকে ধীরে ধীরে বস্তুর মূল ড্রইং করতে হয়। পরের পাতায় ড্রইং করার কিছু সহজ নিয়ম দেয়া হল। এভাবেই নিজেদের ছবি আঁকারও ড্রইং করার চেষ্টা করে যেতে হয়।

ছয় : চোখ মেলে দেখা

চারপাশে কত রকম গাছপালা। একটু ভালো করে দেখা যাক। বটগাছের কথা আগেই বলা হয়েছে। আমগাছ, কাঁঠালগাছ, জামগাছ, তেঁতুলগাছ, চালতাগাছ, জামরুলগাছ, কড়ইগাছ, কাঠবাদামগাছ, কৃষ্ণচূড়া, শিমুল, দেবদারু গাছও আছে। এই গাছের চেহারা একটির সাথে আরেকটির কিছু কিছু মিল থাকলেও গড়ন বা আকৃতির দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। কাঁঠাল ও আমগাছ নিশ্চয়ই দেখতে একরকম নয়। গাছের পাতাও আলাদা। কাঁঠালের পাতা খানিকটা গোলাকৃতির। আমপাতা লম্বাটে। বটগাছ ও অশ্বত্থ গাছের মিল আছে। ভালো করে দেখলে বোঝা যায় গরমিল অনেক। প্রথম গরমিল চোখে পড়ে– বটগাছের অনেক ঝুরি বের হয়। অশ্বত্থ গাছের ঝুরি হয় না। দূর থেকে দেখলে দেখা যায় বটগাছ চারদিকে বেশি ছড়ানো। ওপরে-নিচে চাপা গোলাকার। অশ্বত্থ মোটামুটি গোলাকার।

তেঁতুলগাছ ও চালতাগাছ। দু'টি দেখতে দু' ধরনের। যদিও ফলের স্বাদ প্রায় এক। টক। দু'টি গাছের পাতাই দেখতে খুব সুন্দর। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। তেঁতুলপাতা বেশ ছোট আকারের আর চালতাপাতা তুলনামূলকভাবে আকারে বড় ও লম্বাকৃতির। দূরে দাঁড়িয়ে দেখলে তেঁতুলগাছের পাতা ভিন্ন ভিন্ন দেখা যাবে না। পাতা একটির গায়ে আরেকটি লেগে একাকার। কিন্তু সমান দূরত্বে দাঁড়িয়ে চালতাপাতা পরিষ্কার দেখা যায়। নারকেল, তাল, সুপুরিগাছ ও খেজুরগাছ সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারার গাছ। কলাগাছ তার পাতাসহ আলাদা চেহারা বা আদল নিয়েছে। একটা বাঁশগাছ ও বাঁশঝাড়ের রয়েছে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচিতি। গাছপালার এই যে ভিন্ন ভিন্ন চেহারা ও আকৃতি, তা ভালোভাবে চোখ মেলে দেখতে হয়, তাদের চেহারার ভিন্ন ভিন্ন রূপ মনে রাখতে হয়। এমনিভাবে রঙের বিষয়ে একই কথা। রঙের যে কত রকমফের। বৈচিত্র্য। গাছের পাতা আমরা জানি সবুজ। এই সবুজ এক এক গাছে এক

বটগাছ

অশ্বত্থগাছ

কাঁঠালগাছ

আমগাছ

তাল, নারকেল, সুপুরি, খেজুর, কলা ও কচুগাছ।

চারচালা ঘর

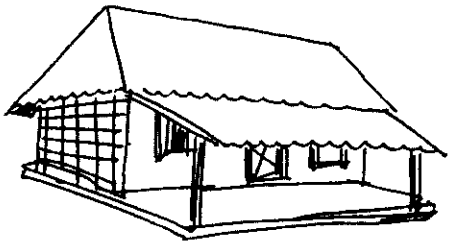

পাঁচচালের ঘর

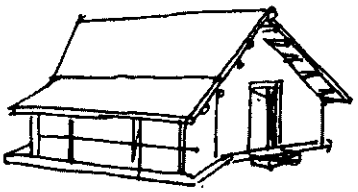

তিনচালা ঘর

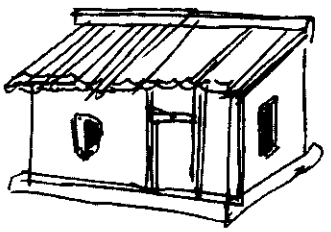

একচালা ঘর

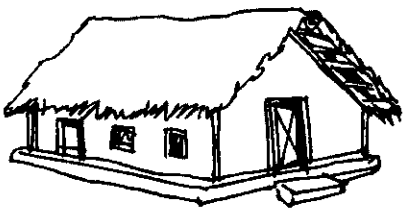

দোচালা ঘর

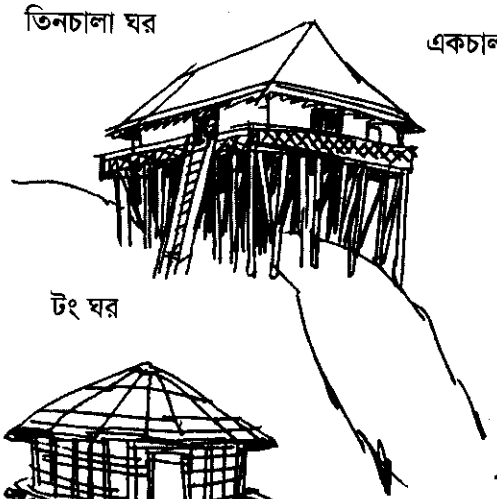

টং ঘর

বারোচালা ঘর

গোলাঘর

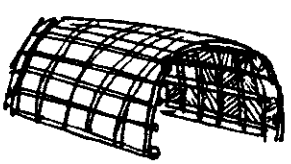

ছই-এর ঘর

দোতলা ঘর

উপরের ঘরগুলোর মতো অনেক রকম ঘর আমাদের দেশে আছে। যেগুলো 'তিনকোনা' ও 'চারকোনা' নকশার সঙ্গে অনেক মিল।

এক রকম। রঙের এই বৈচিত্র্য ও ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা ভালোভাবে মনে রেখে ও ভালোভাবে জেনে নিলে ছবি আঁকা অনেক সহজ হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের ঘরবাড়ি দেখতে কেমন? কত আকৃতির বা চেহারার ঘর আছে? শহরে দালানকোঠা প্রতিটির ভিন্ন ভিন্ন চেহারা। গ্রামে আছে ছনের ঘর, বাঁশের ঘর, টিনের, কাঠের, মাটির, ইট-সিমেন্টেরও। কোনোটি দোচালা, চারচালা ও আটচালা। মাটির ঘরের চেহারা ও টিনের ঘরের চেহারার মধ্যে যথেষ্ট তফাত রয়েছে। দালানকোঠা অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিন্ন চেহারার। ঘরবাড়ির এই যে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি তা ভালোভাবে জেনে নিতে হয়। ছবি আঁকার জন্যে প্রকৃতির এই ঘরবাড়ি, গাছপালা ইত্যাদির আকার ও চেহারা ভালোভাবে দেখতে হয়। ধারণা গ্রহণ করতে হয়। মনের মধ্যে গেঁথে নিতে হয়।

বাংলাদেশে অনেক নদী। নদীতে অনেক নৌকা। নৌকার আকৃতি, চেহারা যে কত রকম তা গুনে শেষ করা যাবে না। এগুলোর আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন– পানসি, ঘাসি, গয়না, সাম্পান, জালি, ছিপ, কোষা, বজরা, মালার, পদি, সারঙ্গ দোরাখা, বাখারি, রপ্তানি, ভেদী, পাতম, জঙ্গ, ডিঙ্গি ইত্যাদি। বিভিন্ন অঞ্চলে এগুলোর দেখা পাওয়া যায়। মাছ ধরার জন্যেও জেলেরা নানারকম নৌকা ব্যবহার করে। নৌকার ছবি আঁকতে হলে জানতে হবে কোন নৌকা আঁকা হচ্ছে। তার চেহারা ও গড়নটি ভালোভাবে জেনে নেয়া প্রয়োজন।

ছবি আঁকার 'বিষয়' অনেক কিছুই হতে পারে। গাছপালা, ঘরবাড়ি, নৌকা, মানুষ, পশুপাখি ও নানারকম বস্তুসামগ্রীও ছবি আঁকার বিষয়। প্রকৃতির সবকিছুই সেজন্যে ভাল করে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হয়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের অর্থ– স্বাভাবিক অবস্থানে দেখা, ডান পাশ, বাম পাশ, সামনে, পেছনে, ওপর ও নিচে থেকে ভালো করে দেখা। চোখের দেখা তো দেখতেই হয়। সেই সাথে ভেতরের দেখাটাও দেখতে হবে বা বুঝতে হবে। ভেতরের দেখা কী তা মদির কাকের ছবি আঁকার কথায় বলা হয়েছে। মানুষ, পশুপাখিকে ভালোভাবে বুঝতে হয় জানতে হয়– যে কোনো বস্তুসামগ্রী সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।

রেখা, চারকোনা ঘর, তিনকোনা ঘর ও গোলাকার ঘর– এগুলোর কথা মনে রেখেই প্রকৃতির বিভিন্ন বস্তুসামগ্রী দেখলে ছবি আঁকা অনেক সহজ হয়ে যায়।

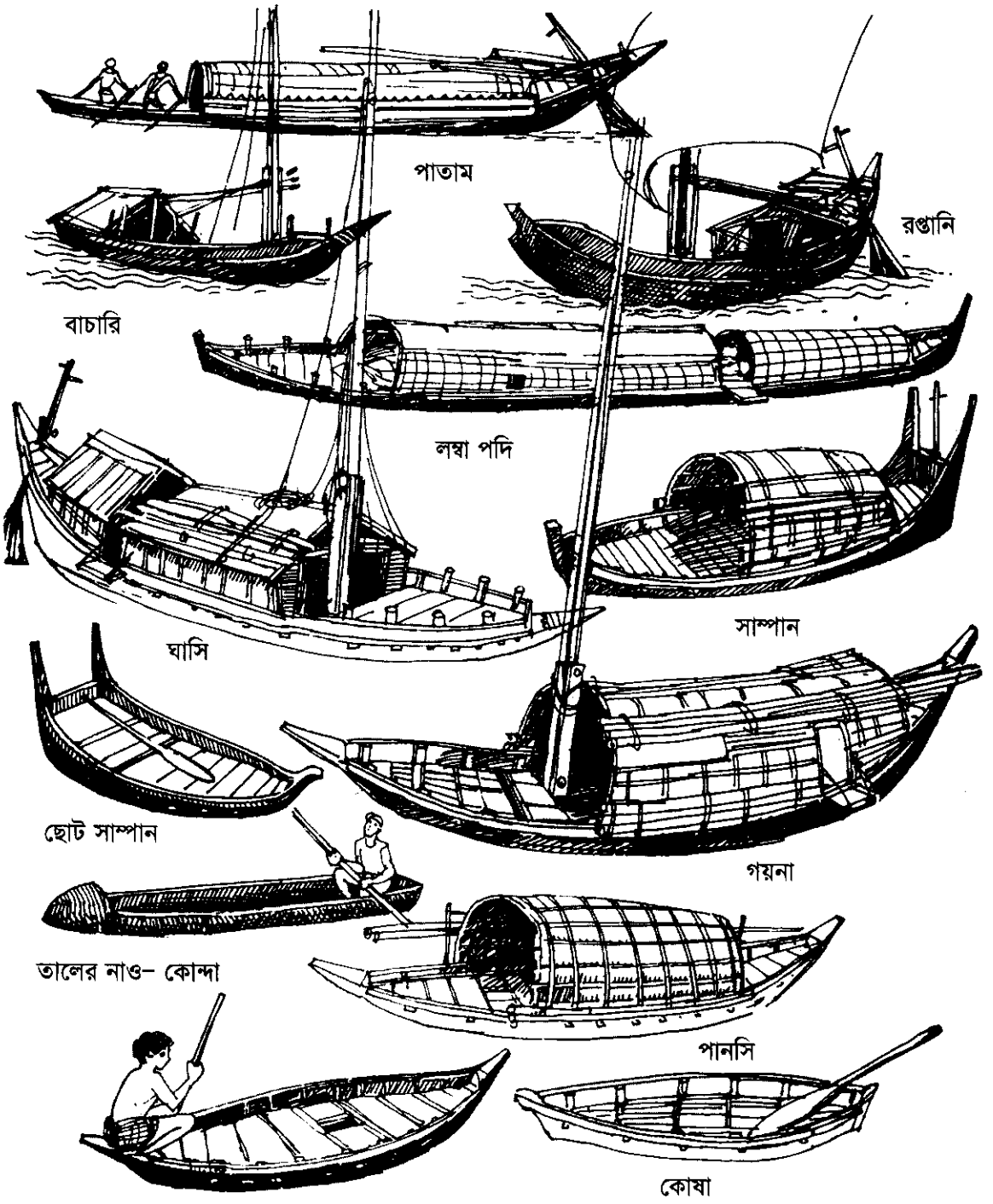

অনেক রকম নকশার নৌকা আছে সারা বাংলাদেশ জুড়ে।

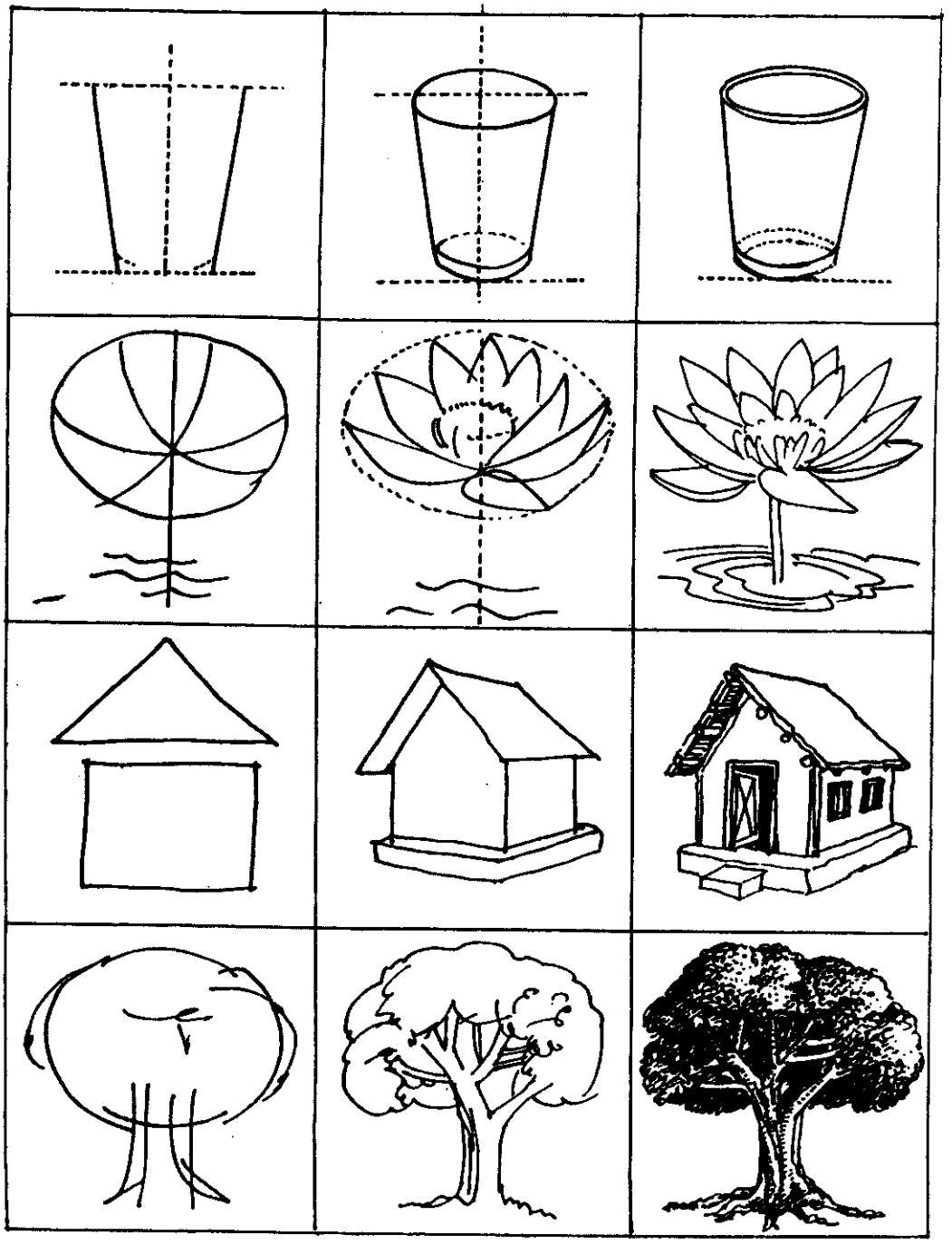

ছবিতে আঁকার সহজ নিয়ম দেখানো হয়েছে।

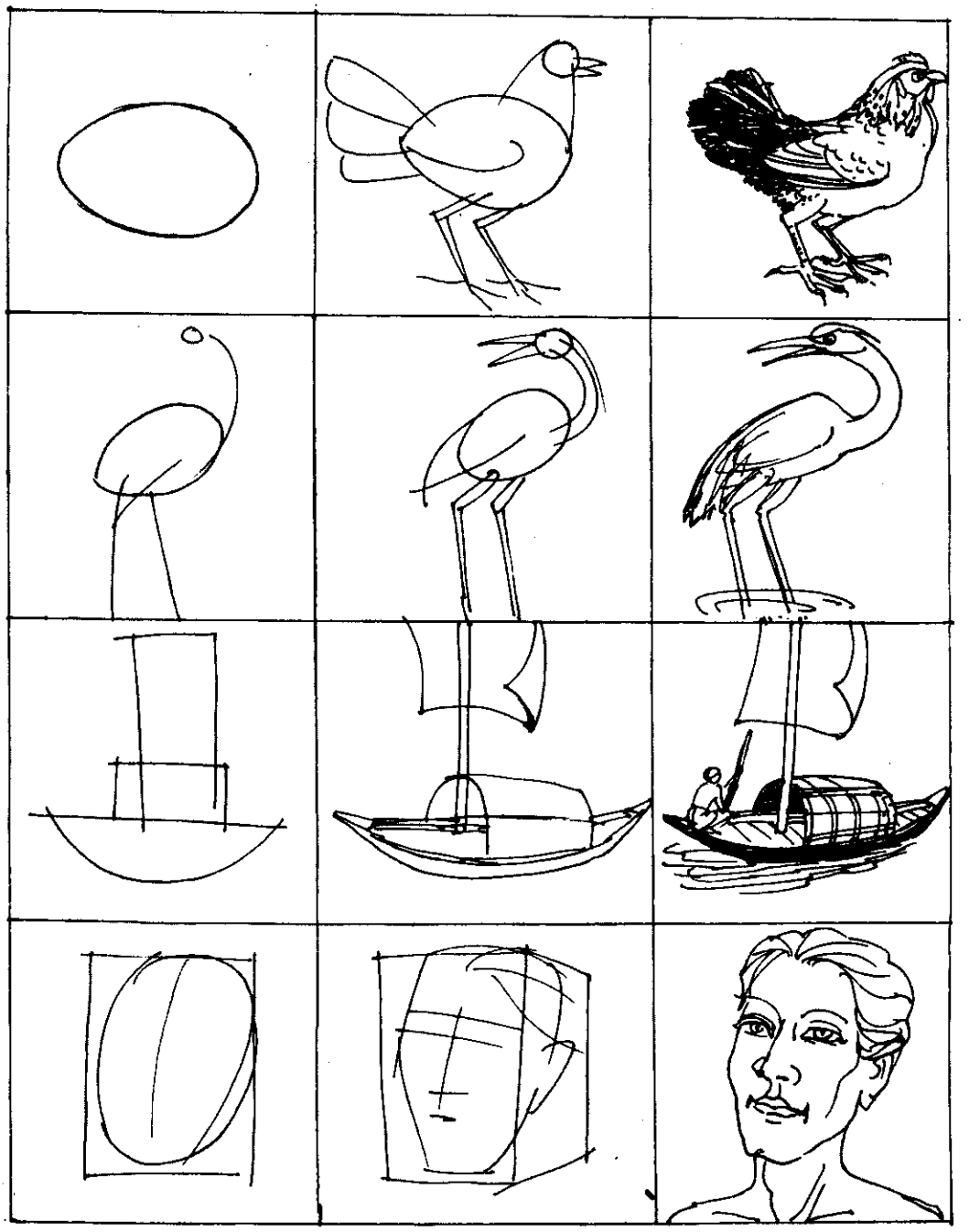

গোলাকার, তিনকোনা ও চারকোনা ঘর থেকে যে কোনো ছবি আঁকা সহজ।

এই ফুলগুলো বাংলাদেশের খুবই পরিচিত ফুল। 'গোল আকার' থেকে ফুলগুলো শুধু রেখা দিয়ে আঁকা হয়েছে। তোমরা প্রথমে এভাবে রেখা দিয়ে আঁকো এবং পরে রং দিয়ে আঁকো।

সাত : রেখার অনেক গুণ

রেখার অনেক গুণ, অনেক শক্তি। রেখা চলতে পারে আপন ছন্দে, যেমন ইচ্ছে তেমন গতিতে। রেখা অবয়ব তৈরি করে। রেখা ধরে রাখে গঠন ও গড়নকে। রেখাকে ছাড়া ছবি আঁকা এক পাও এগুতে পারা যায় না।

তাই রেখা বিভিন্ন শিল্পীর কাছে বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন মাত্রায় মূল্য পেয়েছে। শিল্পীরা ছবি আঁকায় রেখাকে কত রকম ভাবে যে ব্যবহার করেন তার হিসেব-নিকেশ করা সহজ কাজ নয়। আদিম মানুষের ছবি আঁকার কাল থেকেই রেখার এই প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। আদিম মানুষেরা পাহাড়ের গুহায় বাস করত। গুহার দেয়ালে তারা ছবি আঁকত। পশুর হাড়ের সুচালো মাথা দিয়ে পাহাড়ের গায়ে আঁচড় কেটে বা রেখা কেটে তারা ছবি এঁকেছে। তাদের আঁকার বিষয় বা ছবি ছিল সবই আদিম যুগের জীবজন্তু। বিরাটাকার ও শক্তিশালী বাইসন, ম্যামথ, বলগা হরিণ ও ঘোড়ার মতো জন্তু ইত্যাদি। দৃশ্যগুলো সবই শিকারের। কারণ শিকার করা ছাড়া তাদের কোনো কাজই ছিল না। সারাদিন ঘোরা, জীবজন্তু খোঁজা, তারপর কোনো জন্তুর দেখা পেলে তার পেছনে ছোটা। তাকে ঘায়েল করার জন্যে পাথরের অস্ত্র ছুড়ে মারো, না হয় পাথর, গাছের ডাল ও হাড় দিয়ে তৈরি বর্শা বিঁধিয়ে দাও। একটা জন্তু কোনোভাবে শিকার করতে পারলে সবাই মিলে কেটে-ছিঁড়ে আগুনে পুড়ে হৈ-হল্লা করে খাও, ভোজ লাগাও। সব দিনে বা সব সময়ে তারা শিকারে বের হতে পারত না। তখনকার আবহওয়া আজকালকার মতো মোটেই ছিল না। আর যেসব অঞ্চলে আদিম মানুষের গুহা আবিষ্কার হয়েছে, সেসব অঞ্চরের ভূমির গঠন ও আবহাওয়ার কারণে কখনো ঝড়, ভূমিকম্প, তুষারপাত, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হাওয়া বইত। বাইরে বের হওয়ার উপায় থাকত না। আদিম মানুষেরা তখন গুহায় বসে কী করবে। সময় কাটবে কেমন করে? তাই গুহার ভেতর থেকেই শিকার করত। কিন্তু গুহার ভেতর বাইসন, ম্যামথ এসব জন্তু পাবে কোথায়? তাই তাদের ছবি আঁকা। গুহার দেয়ালে আঁচড় কেটে রেখা তুলে প্রথমে ড্রইং করে নিত। তারপর রং লাগাত। রং নিজেরা বানিয়ে নিত। রঙিন মাটি, পাথর গুঁড়ো করে পশুর চর্বি মিশিয়ে রঙ বানাত। তারপর তীর বর্শা এসব পশুদের গায়ে বিঁধিয়ে দেয়ার দৃশ্যও আঁকত। আর এভাবেই ছবি এঁকে চলত পশু শিকার।

পণ্ডিতেরা অনেকেই মনে করেন একটা জাদু-বিশ্বাসের কারণেও আদিম মানুষ গুহার দেয়ালে ছবি এঁকেছে। শিকার করা জন্তুর ছবি এঁকে তারপর শিকার করতে বের হলে ওরকম একটা বড়সড় শিকার করা যাবে।

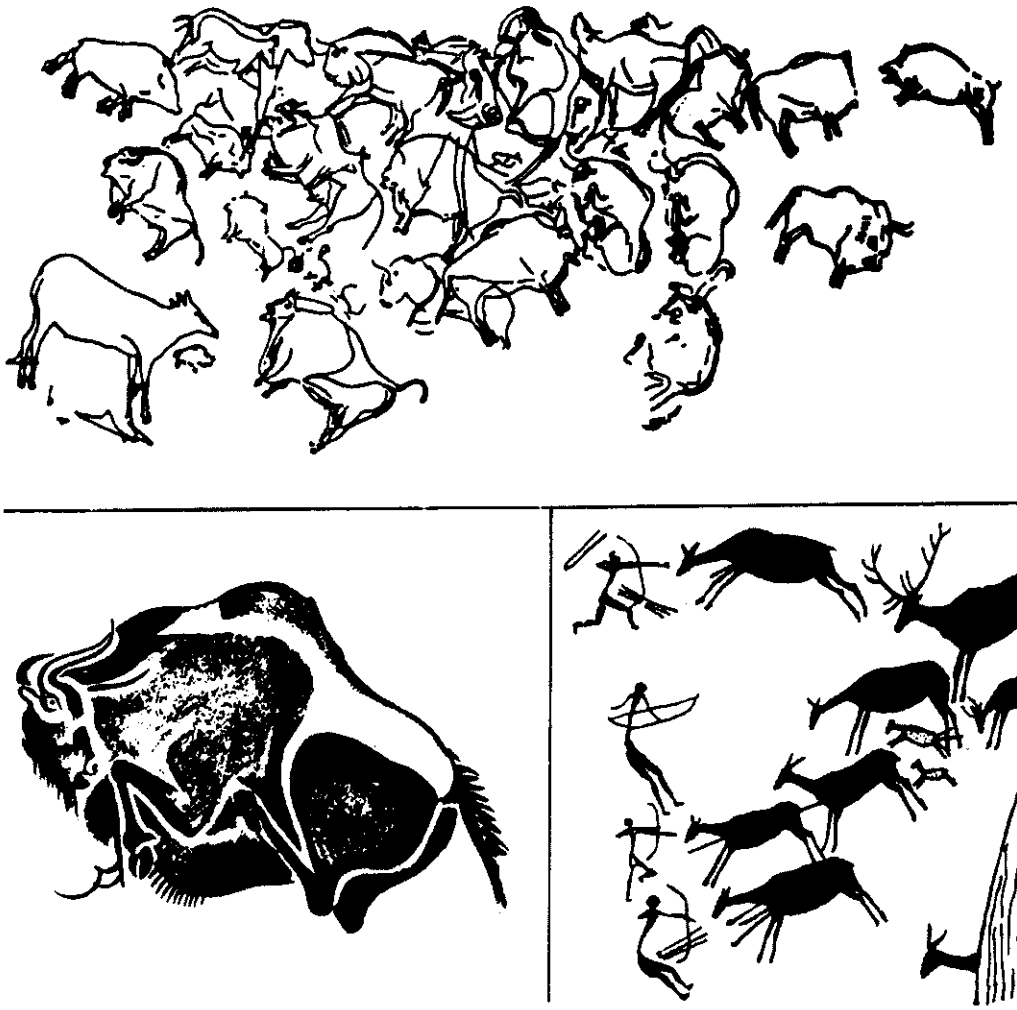

আদিম মানুষের আঁকা ছবি : পাহাড়ের গুহায় পাথুরে দেয়ালে সুচালো ও শক্ত পাথর দিয়ে রেখা টেনে ছবি এঁকে তারপর রং দিয়েছে।

আদিম যুগের পর কত হাজার বছর চলে গেছে। পৃথিবীর কত পরিবর্তন হয়েছে– এক সভ্যতার পর আরেক সভ্যতা এসেছে। বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বৈচিত্র্যময় জীবনযাপন। কত শত শত পরিবর্তন যে হয়েছে তার হিসেব মেলানো কঠিন। কিন্তু অবাক ব্যাপার। আদিম মানুষের ছবি আর শত শত পরিবর্তনের পর বর্তমানের পর বর্তমান কালের শিল্পীদের ছবি মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে ছবিতে রেখার অবস্থান ও ব্যবহার প্রায় একই রকম রয়েছে।

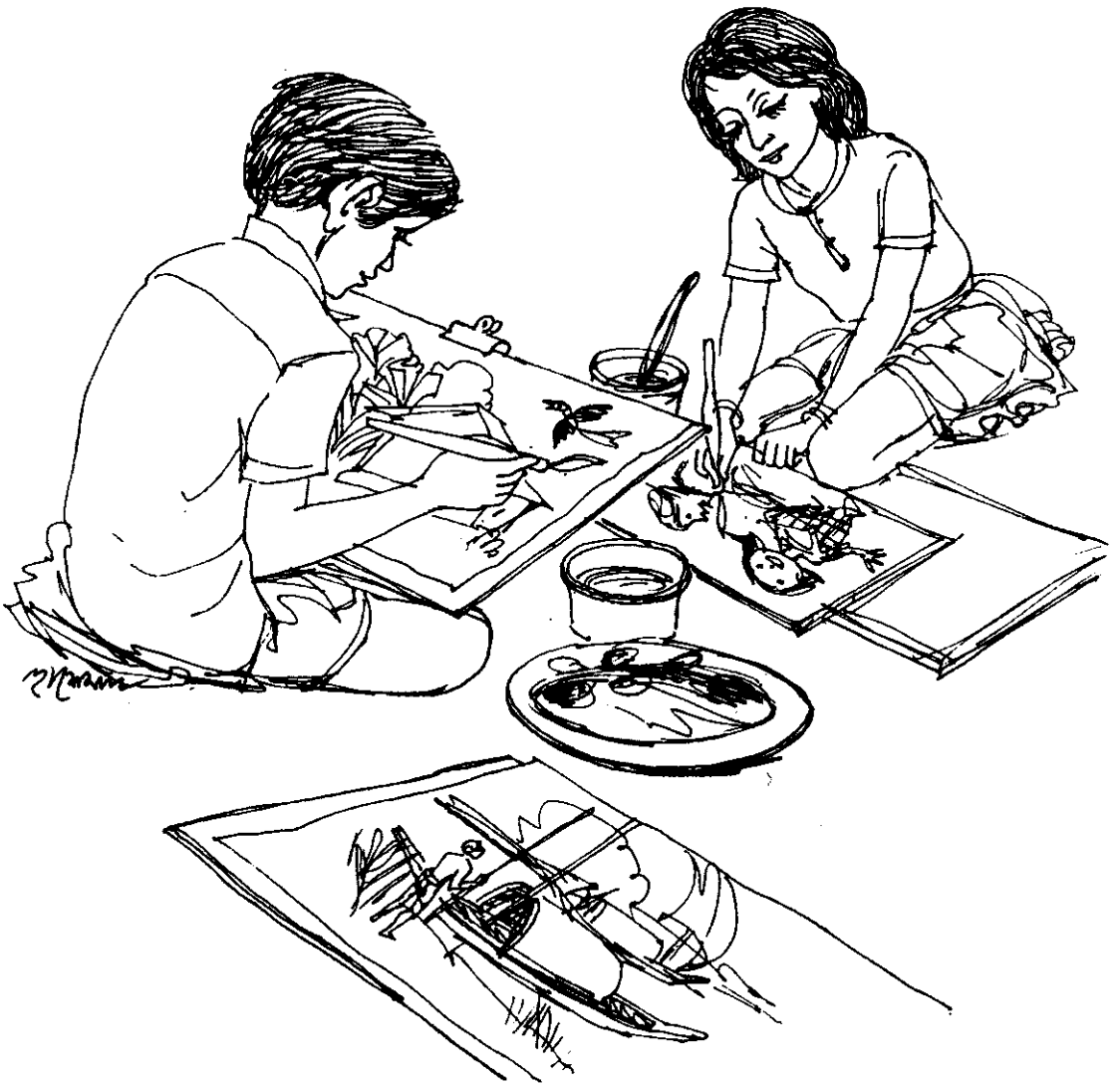

এটি একটি রেখাচিত্র। চিত্রের শিশু দু'টি যে ছবি আঁকছে সেগুলোও রেখাচিত্র।

ছবি আঁকার জন্যে কত রকমের রেখা ব্যবহার করা হয় হিসেব করা সহজ নয়। তবে নির্দিষ্ট কোনো ছবির জন্যে কী রকম রেখা হবে তা নির্ভর করে শিল্পীর নিজের ওপর। অর্থাৎ রেখা মোটা হবে, পাতলা হবে, নাকি গতিশীল হবে। ছবি আঁকার হাতিয়ারের কারণে রেখা নানা রকম এবং নানা গুণের হয়ে থাকে। যেমন– পেন্সিলের রেখা, কলমের রেখা, তুলির রেখা, প্যাস্টেলের রেখা এবং ছুরি দিয়ে কাঠি দিয়ে আঁচড় কেটে রেখা তুলে ধরা যায়।

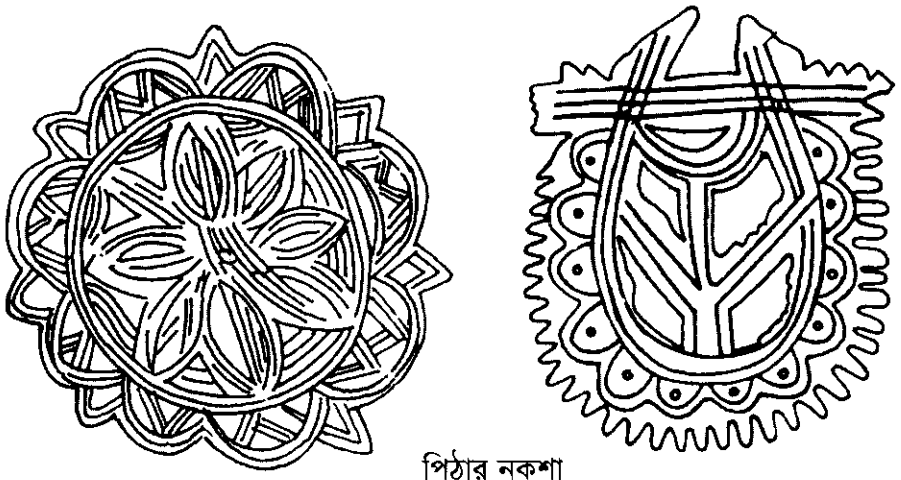

পিঠার নকশা

কাঠের ঘোড়া

মাটির পুতুল

লোকশিল্পে রেখা দিয়ে নকশা ও ছবি।

লোকচিত্রের সঙ্গে এতদিন নিশ্চয় অনেকেরই পরিচয় হয়েছে। নকশিকাঁথা, নকশিপাখা, শখের হাঁড়ি, কাঠের হাতি, ঘোড়া, পুতুল ইত্যাদি। লোকগল্পের ছবি– পট, গাজির পট। এছাড়াও রয়েছে নানা রকম আলপনা। এই আলপনা ও লোকচিত্র রেখাপ্রধান ছবি। অর্থাৎ লোকচিত্রের বেশিরভাগই হল রেখা।

নকশিকাঁথা– সুঁই-সুতা দিয়ে রেখার পর রেখা দিয়ে ছবি ও নকশা করা হয়েছে।

রেখা দিয়ে যে ছবি হয় তাকে আমরা বলি ড্রইং। তেলরং, জলরং, পেন্সিল, কালি-কলমে যে কোনো ছবি আঁকতে গেলে প্রথমেই এই রেখার কাজ– অর্থাৎ ড্রইং করে নিতে হয়। আবার শুধু রেখা দিয়েও অনেক শিল্পী অনেক সুন্দর ছবি এঁকেছেন। আমাদের দেশের দু'জন বিখ্যাত শিল্পীর বেশিরভাগ ছবিই রেখা দিয়ে আঁকা। এঁরা হলেন– শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং পটুয়া কামরুল হাসান। এছাড়াও সারা পৃথিবীতে অনেক শিল্পী আছেন, যাদের রেখা খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও অনেক ছবি নানা রকম রেখায় তৈরি।

ছবি আঁকার মাধ্যম উপকরণ ও অন্যান্য বিষয়

মাধ্যম

ছবি আঁকার মাধ্যম ও উপকরণ অনেক। কাগজ, বোর্ড, ক্যানভাস, রং, তুলি ইত্যাদি। আবার এই কাগজ, ক্যানভাস, রং, তুলি ইত্যাদি যে কত রকমের হয় তা হিসেব করলে রীতিমতো এক গ্রন্থ হয়ে যাবে। এখানে ছবি আঁকার সাধারণ কিছু উপকরণের পরিচয় তুলে ধরা হল।

কাগজ

কাগজ পাতলা, মোটা আবার খসখসে জমিনের, মসৃণ জমিনের, চককে ও বিভিন্ন রঙের হয়। লেখালেখির জন্য আমরা যে কাগজ ব্যবহার করি, তাতে কালি-কলমে ও পেন্সিলের স্কেচ করার মতো বা খসড়া ছবি আঁকার জন্যে ব্যবহার করতে পারি। তবে ভালোভাবে ছবি আঁকার জন্যে সহজলভ্য যে কাগজ তার নাম কার্টিজ কাগজ। কার্টিজ কাগজও পাতলা, মোটা বিভিন্ন মাত্রায় তৈরি হয়। এই কাগজে পেন্সিল, কালি-কলম, জলরং ও প্যাস্টেলে ছবি আঁকা যায়। প্রথম ছবি আঁকার জন্যে, বার বার অভ্যাস করার জন্যে এই কার্টিজ কাগজ সবচেয়ে বেশি উপযোগী। ধবধবে সাদা ও খানিকটা মোটা অফসেট কাগজে কালি-কলমে, কালি-তুলিতে ও পেন্সিলের মাধ্যমে ভালোভাবে ছবি আঁকা যায়। এ কাগজে জলরঙে বা প্যাস্টেলে ছবি ভালো হয় না। মোটা কার্টিজ কাগজের খসখসে জমিনে ও জলরঙের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি 'হ্যান্ডমেড' কাগজে জলরঙে সুন্দরভাবে ছবি আঁকা যায়। বিদেশি কার্টিজ ও কেন্ট পেপার নামে এক ধরনের কাগজ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়, যা জলরঙে ও প্যাস্টেলে ছবি আঁকার উপযোগী। তবে প্যাস্টেলে ছবি আঁকার কাগজ হালকা রঙিন বা গাঢ় এমন কিছু হলে ভালো হয়। আমাদের দেশে বক্স বোর্ড, মাউন্ট বোর্ড নামে মোটা যে কাগজ পাওয়া যায় তার একটা পিঠ সাদা রঙের ও মসৃণ জমিন। উল্টোদিক খসখসে জমিন ও ছাইরঙের বা হালকা বাদামি রঙের পৃষ্ঠায় প্যাস্টেলে সুন্দরভাবে ছবি আঁকা যায়। প্যাস্টেল রঙে আঁকার জন্যে নানা রঙের মোটা কাগজ বিশেষ ভাবে তৈরি হয়ে থাকে। যে বক্স বোর্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা সাধারণত বিভিন্ন দ্রব্যের মোড়ক বা প্যাকেটের জন্যে বাক্স তৈরিতে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ছবি মাউন্ট করার জন্যে অর্থাৎ ছবির চারদিকে মার্জিন দিয়ে ছবি সুন্দরভাবে বাঁধাই করার জন্যে বক্স বোর্ড উপযোগী। বক্স বোর্ডের মতোই অনেকটা আর্ট কার্ড। আর্ট কার্ডের দু' পৃষ্ঠাই মসৃণ জমিন। এই কার্ডে একমাত্র কালি-কলমে ও কালি-তুলিতে ছবি আঁকা যায়। তেমনিভাবে আর্ট পেপার আঁকার জন্যে মোটেই সুবিধার কাগজ নয়। তবে ভালো ছাপা, বিশেষ করে রঙিন ছবি ছাপার জন্যে উপযুক্ত কাগজ।

পিসবোর্ড নামে গাঢ়-বাদামি রঙের যে কাগজ রয়েছে তাতে প্যাস্টেল রঙে ছবি আঁকা যেতে পারে। তবে একটা কথা বলা দরকার– যে ছবি আঁকবে অর্থাৎ শিল্পী নিজেই তার পছন্দমতো এবং যে কাগজে আঁকতে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে তা সংগ্রহ করে নেবে। কাগজের ওপর রং রেখার ছবি আঁকা হয়– এ কথা আমরা সবাই জানি। আবার কাগজ ছিঁড়ে-কেটে তা বোর্ড বা অন্য কাগজে আঠা দিয়ে সেঁটে ছবি তৈরি হয়। এর জন্যে নানা রঙের পাতলা মোটা কাগজ এবং পত্রপত্রিকার কাগজ, ছাপা লেখা ছবি কেটে-ছেঁটে ব্যবহার হয়ে থাকে। এ রকম ছবিকে বলা হয় 'কোলাজ'।

পেন্সিল

সাধারণ লেখা বা আঁক-জোক করার জন্যে আমরা HB পেন্সিল ব্যবহার করি। ছবি আঁকার জন্যে ব্যবহার হয় 2B, 3B, 4B, 5B ও 6B গ্রেড বা মানের পেন্সিল। পেন্সিলের গায়ে এই নম্বরগুলো লেখা থাকে। HB পেন্সিলে কাগজে খুব গাঢ় দাগ কাটে না। 2B, 3B, 4B, 5B ও 6B তে যেয়ে ধীরে ধীরে শিস নরম হতে থাকে এবং হালকা থেকে গাঢ় রং বা কালো দাগ কাটতে পারে। শিল্পী ইচ্ছে করলে শুধু পেন্সিলেই একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকতে পারে। 2B, 4B ও 6B এই তিনটি পেন্সিল দিয়ে অথবা যে কোনোটি দিয়েও একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি আঁকা সম্ভব।

কালি-কলম ও কালি-তুলি

সাধারণত যে কলম দিয়ে লেখার কাজ হয় সেই কলমেই ছবি আঁকা যায়। তবে ছবি আঁকার জন্যে সরু রেখা ও মোটা রেখার অনেক রকম কলম আছে। সিগ্‌নেচার পেন বা ফেল্ট পেন নামে যেসব কলম আছে তাতেও ছবি আঁকা সম্ভব। শিল্পীরা অনেকেই স্কেচ করার প্রয়োজনে ওসব কলম ব্যবহার করে থাকেন। তবে সিগ্‌নেচার পেন ও ফেল্ট পেন নানা রঙের হয়ে থাকে। নিবের কলম বা ড্রইং নিব দোয়াতের কালিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে অনেক শিল্পী কালি-কলমে ছবি আঁকেন। এ কালি অবশ্যই কালো। ছবি আঁকার জন্যে বিশেষ ধরনের কালি তৈরি হয়। কালো কালিকে অনেকেই চাইনিজ ইঙ্ক বলে। অতি প্রাচীনকাল থেকে চীন দেশের শিল্পীরা ছবি আঁকায় কালো কালিকে বেশি গুরুত্ব দিত। এখনো দিয়ে থাকে। তাদের কালো কালির অধিক ব্যবহার থেকেই ছবি আঁকার কালো কালির নাম হয়ে গেছে চাইনিজ ইঙ্ক। অবশ্য এই রকম কালো কালিকে ইন্ডিয়ান ইঙ্কও বলা হয়। আমাদের দেশের বিখ্যাত শিল্পী জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান দু'জনেই শুধু কালো কালিতে অনেক ছবি এঁকেছেন। জয়নুল আবেদিনের 'দুর্ভিক্ষ-১৯৪৩' বিষয়ের সবগুলো ছবি কালো কালিতে আঁকা। তিনি ছবি আঁকার জন্যে খাগের কলম নিজেই বানিয়ে নিতেন। খাগ গ্রামে প্রচুর পাওয়া যায়। একইভাবে বাঁশের সরু কঞ্চি দিয়েও অনেকেই কলম বানিয়ে ছবি আঁকার কাজে ব্যবহার করে।

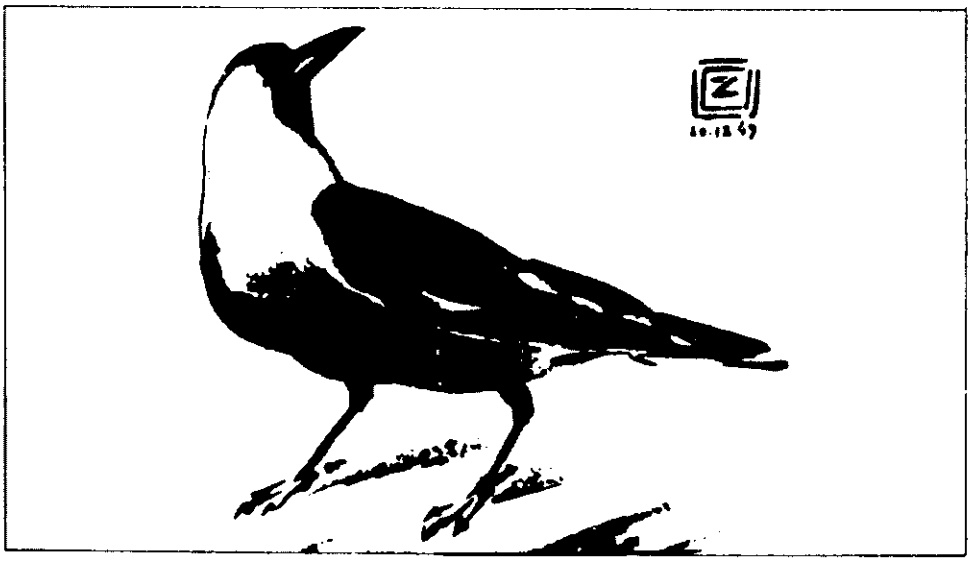

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের কালি ও তুলিতে আঁকা কাকের ছবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালি ও কলমে আঁকা নিজের মুখের ছবি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেসব ছবি এঁকেছেন তার বেশিরভাগই কালি ও কলমে। কবিতার লেখা কাটাকুটি করতে যেয়েই তাঁর ছবি আঁকা শুরু। তবে তিনি কালো কালি, সবুজ ও লাল কালি বেশি ব্যবহার করেছেন।

তুলিতে কালি লাগিয়ে অনেক সুন্দর ছবি আঁকা সম্ভব। তবে তুলির আঁকা ছবি কলমের আঁকা ছবির মধ্যে অনেক প্রভেদ এবং তা তুলির কারণেই হয়।

তুলি

তুলি ছাড়া ছবি আঁকার কথা চিন্তাই করা যায় না। বিভিন্ন ধরনের রং, কাগজ ও ক্যানভাসের কারণে নানা রকম তুলি তৈরি হয়ে থাকে। কালি ও জলরঙের ছবি আঁকার জন্যে সাধারণত নরম পশমের তুলি ব্যবহার হয়। তেলরং, পোস্টার রং ও অন্যান্য বেশি আঠালো রঙের জন্যে অপেক্ষাকৃত শক্ত পশমের তুলি ব্যবহার করা হয়। তুলির পশম যোগাড় করা হয় বিভিন্ন পশুর পশম থেকে। 'স্যাব্‌ল' নামে একরকম বেজি জাতীয় জীব আছে, যার পশম খুবই মূল্যবান। জলরঙের ভালো তুলি তৈরি হয় এই 'স্যাব্‌ল হেয়ার' থেকে। স্যাব্‌ল হেয়ারে তুলির গায়ে লেখা থাকে 'স্যাব্‌ল হেয়ার'। উটের পশম থেকেও জলরং তুলি তৈরি হয়। বর্তমানে অবশ্য কৃত্রিম উপায়ে পশম তৈরি করে তুলি তৈরি হচ্ছে। আঁকার সুবিধার জন্যে তুলি সরু থেকে ধীরে ধীরে মোটার দিকে নানা আকারে তৈরি হয়। একদম সরু তুলির নম্বর ০০ (ডাবল শূন্য)। তারপর ০ (শূন্য)। এভাবে ১ নং থেকে মোটা হতে হতে ২০/২৫ নম্বর পর্যন্ত মানের তুলি হয়।

ছবি আঁকার আরো কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণ রয়েছে। যেমন বোর্ড, ক্লিপ, ইজেল ইত্যাদি। বোর্ডের মধ্যে কাগজ ক্লিপ দিয়ে আটকিয়ে ছবি আঁকার অনেক সুবিধা। আর ইজেল হল বোর্ড রাখার স্ট্রান্ড। এই স্ট্যান্ড বা ইজেল কাঠ দিয়ে বানিয়ে নিতে হয়। তবে ইজেল না থাকলেও ছবি আঁকায় খুব একটা অসুবিধা হয় না। অনেকেই মেঝেতে বসে হাতে বোর্ড নিয়ে ছবি আঁকে। কেউ কেউ টেবিলে বোর্ড রেখে ছবি আঁকে। কে কীভাবে আঁকবে তা নির্ভর করে শিল্পীর উপকরণ সংগ্রহ ও সুবিধার ওপর।

রং পরিচিতি

রং ছাড়া কি ছবি হয়? হয় না? তবে পেন্সিলে কাঠ-কয়লায় বা কালিতে যে ছবি আঁকা হচ্ছে তাকে কী বলব? হ্যাঁ পেন্সিল, কাঠকয়লা, কালি সবই রং। এ ক'টি রং হিসেবেই ছবি আঁকায় ব্যবহার হচ্ছে। তবে রঙিন ছবি বলতে আমরা সাধারণত লাল-নীল-সবুজ নানা রঙের ছবি বুঝে থাকি।

ছবি আঁকার রং নানা রকম অবস্থায় পাওয়া যায়। জলরং পাওয়া যায় টিউবে, বাক্সে খোপ খোপ করে সাজানো, ছোট ছোট কেক হিসেবে এবং পাউডার হিসেবে। পোস্টার রং পাওয়া যায় কাচের কৌটায়। পোস্টার রং দিয়ে জলরঙের মতো ছবি আঁকা যায়। যদিও জলরং ও পোস্টার রং দু'টির মধ্যে কিছু গুণগত পার্থক্য আছে। দু'টি রংই পানি মিশিয়ে আঁকতে হয়। জলরং হালকা ও স্বচ্ছ। একটি রঙের ওপর আরেকটি রঙের প্রলেপ দিলে আগের রংটি একদম হারিয়ে যায় না। দুটো রংকেই একসাথে উপলব্ধি করা যায়। পোস্টার রঙে একটির ওপর আরেকটি রঙের প্রলেপ দিয়ে সম্পূর্ণ ঢেকে দেয়া যায়। জলরঙে একটু সাবধানে কাজ করতে হয়। পোস্টার রঙে ছবি সহজে ও স্বচ্ছন্দে আঁকা যায়। ছোটদের পোস্টার রঙে ছবি আঁকাই (জলরঙের মতোই) ভালো ও সহজ। পাউডার রং পানিতে মিশিয়ে নিয়ে জলরঙে ছবি আঁকা যায়। তবে একটু অ্যারাবিক গাম বা আইকা গাম পাতলা করে মিশিয়ে নিলে আঁকা সহজ ও স্থায়ী হয় এবং ভিন্ন মাত্রা পাওয়া যায়।

প্যাস্টেল রং দু' রকম গুণের তৈরি হয়ে থাকে। চক প্যাস্টেল, তেল প্যাস্টেল বা মোম প্যাস্টেল। ছোট ও সরু কাঠির রূপে এই রং বাক্সের মধ্যে থাকে। রঙের দোকানে খোঁজ করলেই পেয়ে যাবে দেশ-বিদেশের তৈরি চক প্যাস্টেল ও মোম প্যাস্টেল। তেল প্যাস্টেলকে ইংরেজিতে অয়েল প্যাস্টেল বলে। প্যাস্টেল রঙের বাক্সে অয়েল প্যাস্টেল লেখা থাকে। চক প্যাস্টেলে ছবি আঁকার পর তা স্থায়ী করার জন্যে তরল স্বচ্ছ (ফিক্সেটিভ) স্থায়ীকরণ বস্তু খুব সাবধানে ছবিতে স্প্রে করে প্রলেপ দিতে হয়। তা না হলে ছবি নাড়াচাড়ার সময় চক প্যাস্টেলের গুঁড়ো ঝরে যায় বা অন্য বস্তুতে লেগে হালকা হয়ে যায়। সেদিক থেকে তেল প্যাস্টেলে ছবি আঁকা অনেক সুবিধা।

ছবির বিষয়বস্তু

ছবি আঁকার বিষয়বস্তু ছড়িয়ে আছে আমাদের চারপাশে। একটু চোখ মেলে তাকালেই দেখা যাবে আমাদের জীবনযাপনে, পরিবেশে ও প্রকৃতির মাঝে ছড়িয়ে আছে অনেক বিষয়বস্তু। আমরা যে যেখানে বাস করি, তার পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ভালো জানা থাকে। ভালোভাবে সব কিছু দেখা থাকে। যে গাঁয়ে থাকে তার পক্ষে পাড়াগাঁয়ের ঘরবাড়ি, গাছপালা, মাঠঘাট, নদী-নৌকা, পাট কাটা, জেলেদের মাছধরা, গুনটানা, ধান মাড়াই, ধানভানা, নদীর ঘাট, পুকুর ঘাট, বেদেদের নৌকা বহর, সাপখেলা, খেলাধুলা, নৌকাবাইচ, বিয়ের অনুষ্ঠান, ঈদ, পূজা, মেলা, যাত্রা, কবিগানের লড়াই, ওয়াজ মাহ্‌ফিল, একতারা হাতে বাউল, ফকির-দরবেশ এমনি অনেক বিষয়বস্তু রয়েছে ছবি আঁকার জন্যে।

শহরের জীবনযাপন গ্রাম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। শহরের রাস্তাঘাট, বড় দালানকোঠা, গলি, বস্তি, পার্ক, বাজার, খেলাধুলা, শহরের অনুষ্ঠান, উৎসব ছবি আঁকার

কালো কালি বা
চাইনিজ ইন্‌ক

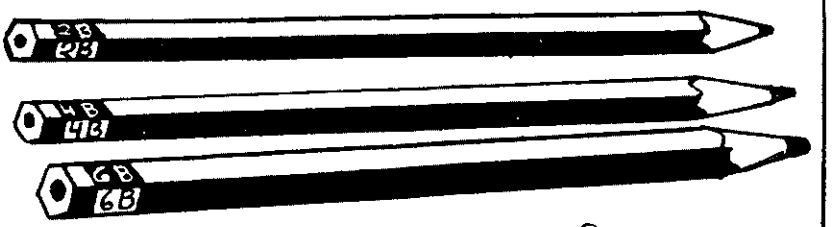

2 B. 4 B ও 6 B পেন্সিল

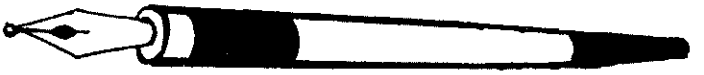

নিবের কলম

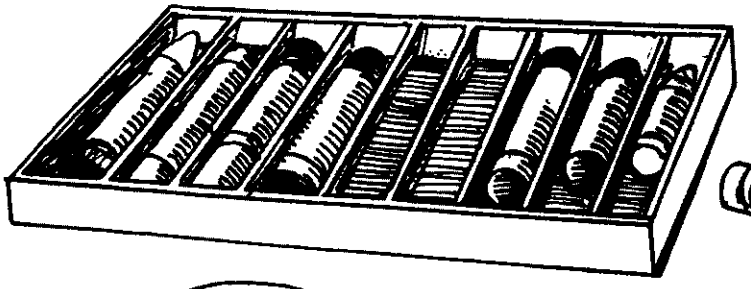

প্যাস্টেল রং

পোস্টার রং

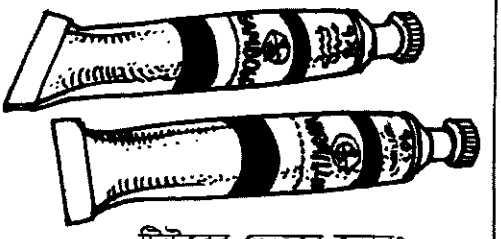

টিউবের ভেতরে জলরং

ছবি আঁকার জন্যে রং তুলি কাগজ যোগাড় করে রাখতে হয়।

তুলিতে আঁকা শিল্পী কামরুল হাসানের দু'টি ছবি - 'বক' ও 'গরু'

শিশু সফিউল আলমের ছবি - বয়স ৩

বিষয়বস্তু হতে পারে। শহরে চিড়িয়াখানায় আছে নানা রকম জীবজন্তু। পশুপাখির চালচলন, মজার মজার সব কাণ্ডকারখানা, শুয়ে থাকা, বসে থাকা, খেলাধুলা, নানা রকম অঙ্গভঙ্গি এমনি অনেক কিছুই হতে পারে আঁকার বিষয়বস্তু।

গাঁয়ের প্রায় সব বাড়িতেই হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, কুকুর, বেড়াল ইত্যাদি পোষা হয়। বনের পাখিও শখ করে অনেকে পোষে। শহরের বাড়িতেও পোষা জীবজন্তু আছে। পোষা পশুপাখি ছবি আঁকার বিষয় হিসেবে অনেক শিল্পীই গ্রহণ করে থাকে।

নামকরা শিল্পীদের অনেক বিখ্যাত ছবি আছে পশুপাখিকে বিষয় করে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন কাক ও গরুকে বিষয়বস্তু করে এবং কামরুল হাসান গরু, হাতি, ঘোড়া, শেয়াল, সাপ, পেঁচা ও পাখিকে বিষয়বস্তু হিসেবে ব্যবহার করে অসংখ্য ছবি এঁকেছেন। চৈনিক শিল্পকলায় অনেক শিল্পীই মাছ, পাখি, ঘোড়া, পাণ্ডা ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য বিখ্যাত ছবি উপহার দিয়েছেন।

প্রিয় কোনো মানুষের প্রতিকৃতি বা মুখের চেহারা বিষয়বস্তু করে ছবি আঁকা যায়।

যে বিষয়বস্তু নিয়ে শিল্পী ছবি আঁকেন সে বিষয়ে তার ভালোভাবে ধারণা থাকতে হবে। গ্রামে যে কখনো যায়নি, নৌকা দেখেনি, নদী দেখেনি, সে কীভাবে গ্রামের ছবি আঁকবে? সুতরাং গ্রামের ছবি আঁকতে হলে গ্রামের ঘরবাড়ি, নৌকা, মাঝি, নদী, গাছপালা ইত্যাদি ভালোভাবে দেখতে হবে। পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। শহর-বন্দরের ছবি আঁকার বিষয়েও একই রকম ভাবে সচেতন হতে হবে।

বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে-শুনে নিজের কল্পনা ও চিন্তাকে প্রকাশ করে ছবিকে সবদিক থেকে সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

ছবি আঁকার কিছু সাধারণ নিয়ম

ছবি আঁকতে হয় নিজের ইচ্ছেমতো। আঁকিয়ে যা ভাবেন, যে বিষয়ে আঁকতে চান তা নিজের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য অনুযায়ী শিল্পী সহজভাবে ছবিটি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন। শিশুদের ও ছোটদের ছবি আঁকার ধরাবাঁধা নিয়ম ইত্যাদির প্রতি জোর দেয়ার প্রয়োজন নেই। তারা যা ভাবে, যখন যা ইচ্ছে রং রেখায় কাগজটা ভরে তুলতে পারলেই হল। তাদেরকে শুদ্ধ ড্রইং ও অন্যান্য নিয়মকানুন শেখানোর ফল মোটেও ভালো হয় না। ছবি সুন্দর ও প্রাণবন্ত হয় না। ছোটবেলা থেকে যে সহজ ও স্বাভাবিকভাবেই ছবি এঁকে এসেছে, তার আঁকা কখনোই বয়স্ক শিল্পীদের মতো হবে না। ছোটদের আঁকার একটা চরিত্র বা আলাদা রূপ থাকে। তাদের আঁকা গরু, তাদের আঁকা মাছ, গাছপালা, মানুষ সব কিছুই হয় শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ছবিতে একটা পরিবর্তন ঘটে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণিতে শিশুরা সহজ ড্রইং ও ছবি আঁকার নিয়মের সঙ্গে কিছুটা পরিচিত হতে পারে। অষ্টম শ্রেণিতে এসে সেসব নিয়মের খুব একটা পরিবর্তন হবে না। তবে আরো বেশি করে অভ্যাস করতে নিয়ম ও কলাকৌশলগুলো বেশি করে রপ্ত করতে হবে। যে কয়টি সাধারণ নিয়ম রপ্ত করতে হয় তা হল আকৃতি ও গঠনসহ ড্রইং, দূরত্ব, অনুপাত, আলোছায়া, বিষয় সাজানো ও রঙের ব্যবহার।

আকৃতি ও গঠনসহ ড্রইং

আমাদের চারপাশে যেসব ঘরবাড়ি, গাছপালা, নৌকা, গাড়ি-ঘোড়া, মানুষ, পশুপাখি রয়েছে তা ভালো করে দেখতে হয়। দেখতে কেমন, কোন চেহারার। আসল রূপটি কী রকম। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ওপরের বিষয়গুলো আঁকতে গিয়ে যথাসম্ভব সঠিকভাবে সেগুলোর আদল বা রূপ ফুটিয়ে তোলার ইচ্ছে হয়। আর সে জন্যেই কিছু নিয়ম রপ্ত করতে হয়। বার বার এঁকে অভ্যাস করতে হয়। ভালো করে দেখলে বোঝা যায় প্রকৃতির সব জিনিসই তিনটি আকৃতি বা আদলের মধ্যে ধরে রাখা যায়। এ তিনটি আকৃতি হল– গোল আকৃতি, চারকোনা আকৃতি, তিনকোনা আকৃতি। মানুষ, জীবজন্তু বা কোনো কিছু আঁকার আগে তার আদল ও রূপ এই তিনটি আকৃতির কোনটির সাথে মিলে যায় তা ঠিক করে ধীরে ধীরে ড্রইং শুদ্ধ করে নিতে হয়। অতএব, তিনটি প্রধান আকৃতি বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের আকৃতিতে পরিবর্তিত হতে পারে। আবার যে কোনো বস্তু আঁকতে গেলে তার আকারের প্রয়োজন হয়। প্রধান আকার তিন প্রকার হয়ে থাকে। যথা ছোট, মাঝারি ও বড়। চিত্রে আকৃতি ও আকারের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। ছবি আঁকতে গেলেই বিষয়বস্তুতে সম আকার, সম আকৃতি, কখনো বা সম আকার পৃথক আকৃতি অথবা পৃথক আকার সম আকৃতি কিংবা পৃথক আকার পৃথক আকৃতি পরিলক্ষিত হয়।

কয়েকটি ছবি এঁকে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। তাই কোনো বস্তুর ছবি আঁকার সময় তা মোটা, সরু, গোলাকার, চারকোনা ঘরের মতো না তিনকোনা ঘরের মতো তা ভালো করে দেখে বুঝে নিতে হয়। প্রয়োজনে ৩২ ও ৩৩ পৃষ্ঠার ছবি পুনরায় দেখা যেতে পারে।

দূরত্ব ও অনুপাত

যে কোনো ছবিতে সামনে-পেছনে কাছে-দূরে ও আকারে ছোট-বড় ও পাশাপাশি অবস্থান ইত্যাদির গুরুত্ব থাকে। মনে করা যাক একটি ছবি– তাতে নদী, গাছপালা, মানুষ ও নৌকা রয়েছে। মানুষ অনুপাতে নৌকা কত বড়, তার সাথে গাছ থাকলে সেটা কত বড় হওয়া

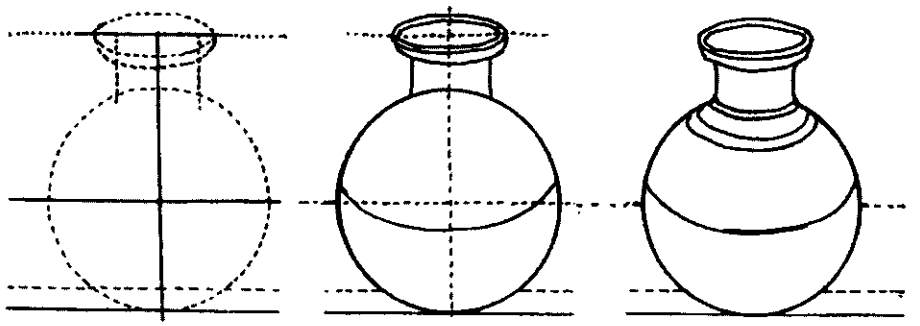

কলসির সঠিক চেহারা ঠিক রেখে ড্রইং করার সহজ নিয়ম।

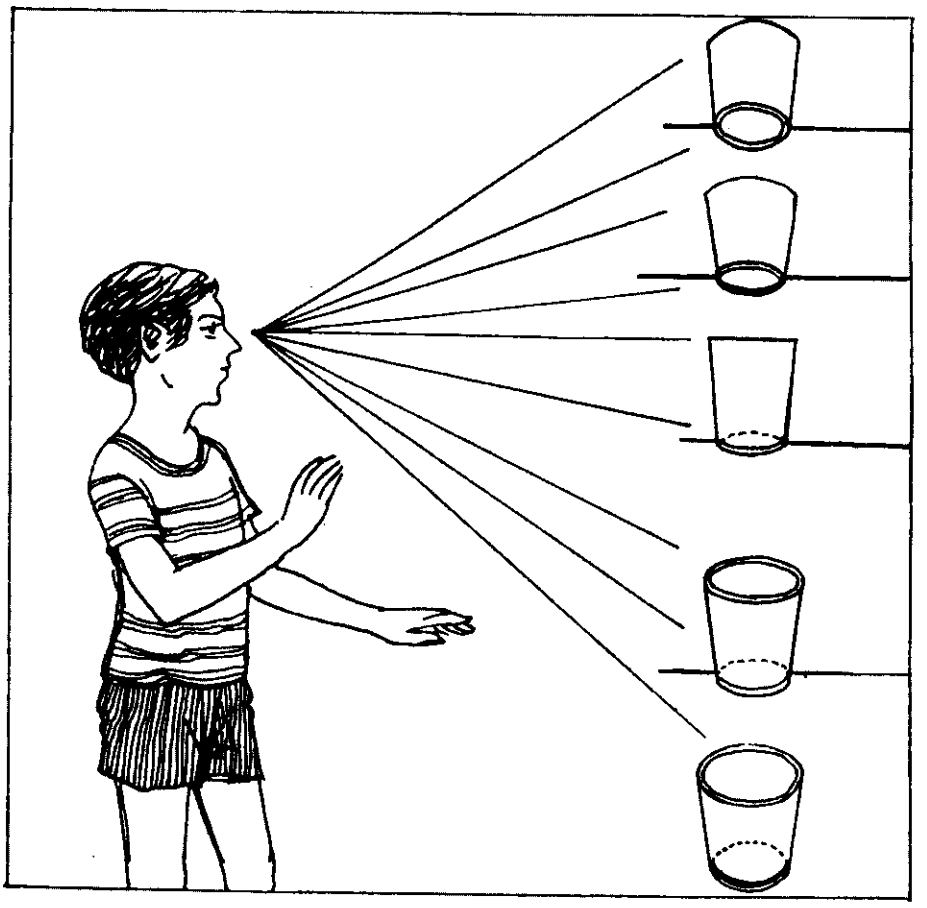

একটি গ্লাসকে চোখের সমান্তরালে যে রকম দেখব, সমান্তরালের উপরে ও নিচে অন্য রকম দেখব। ছবি আঁকার সময় এই চোখের দেখা বিষয়টি মনোযোগ দিয়ে আঁকতে হয়।

ছবিতে 'দূরে-কাছে' আনুপাতিকভাবে আঁকতে হবে।

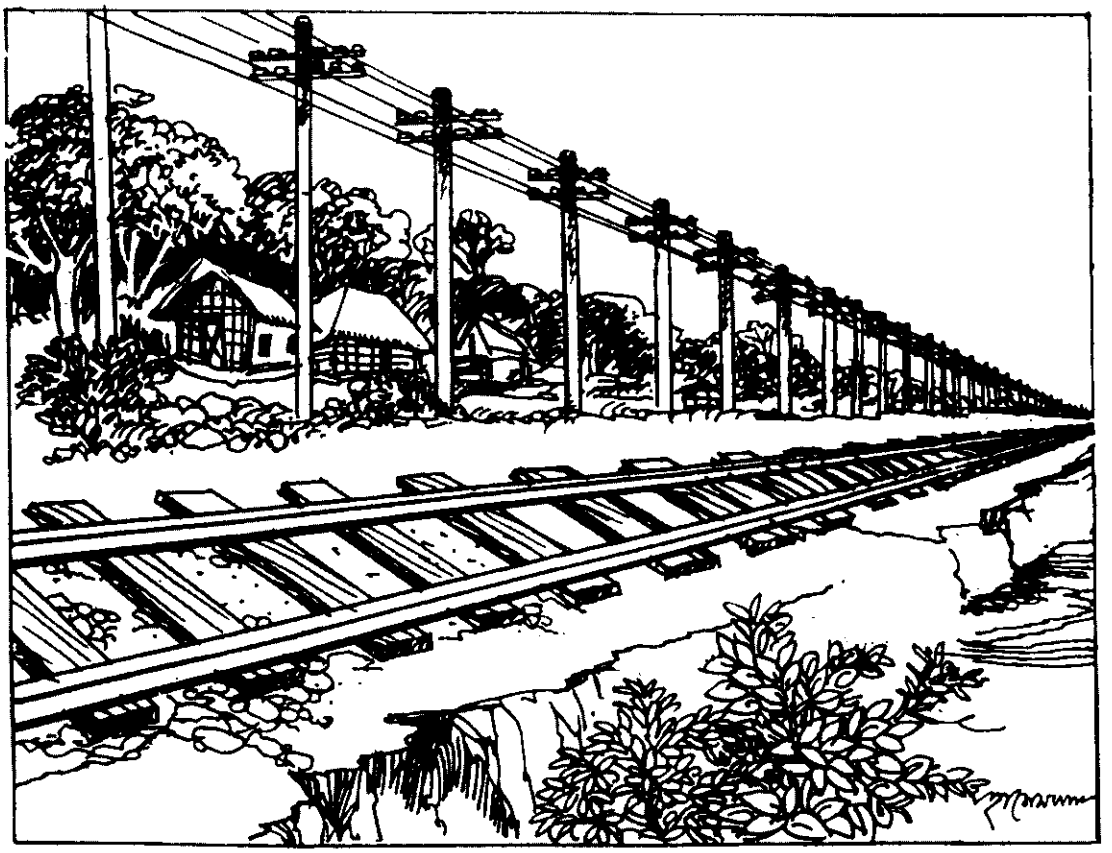

আমরা সবাই জানি রেল লাইনে লোহার পাত দু'টি সমান্তরালভাবে বসানো – কোথাও সামান্যতম হেরফের নেই। যে কোনো একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখলে দেখা যাবে দূরে– অনেক দূরে গিয়ে লাইন দু'টি ধীরে ধীরে কাছাকাছি হয়ে একটা বিন্দুতে মিশে গেছে। একইভাবে গাছপালা টেলিগ্রাফের পিলার ও তার বিন্দুর রেখায় মিশেছে। আকাশ ও মাটি সেই রেখায় মিশে যাচ্ছে। আমরা এভাবেই দেখতে অভ্যস্ত। এই সামনে-দূরে ছবির বস্তুগুলো সঠিকভাবে আঁকতে হয়।

প্রয়োজন তা ভেবে-চিন্তে ঠিকমতো আঁকতে হয়। ছোট ও বড় বস্তুর তারতম্য বা অনুপাত ঠিকমতো তুলে ধরতে হয়। আবার তিনটি নৌকা বা অনেক মানুষ থাকলে সামনের মানুষ কত দূরে এবং গাছপালা ইত্যাদি কাছেরটির অনুপাতে দূরেরটি কত ছোট হবে তা ঠিকমতো আঁকতে পারলেই ছবির মধ্যে দূরত্ব বোঝানো যাবে।

অতএব অঙ্কনের ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত মূল্যবান। ছবি যতই সুন্দর হোক না কেন, অনুপাতের অভাবে কোনো অবস্থাতেই বাস্তবধর্মী ছবি হতে পারে না। অনুপাতের প্রধান

লক্ষ্য হচ্ছে তুলনামূলকভাবে একটি জিনিস অপর একটি জিনিস হতে কত বড় বা ছোট তা নিরূপণ করা।

আলোছায়া

রেখাচিত্র (ড্রইং) ও নকশা (ডিজাইন অলঙ্করণ) ছাড়া যেসব ছবি আঁকা হয় তাতে আলোছায়ার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলোছায়ার মাধ্যমে ছবির বিষয়বস্তুর নিকটত্ব, দূরত্ব, পারিপার্শ্বিকতা, ওপর-নিচ সঠিকভাবে দেখানো যেতে পারে। নতুবা ছবি প্রাণবন্ত হয় না। তাই ছবিতে আলোছায়া ঠিকমতো ফুটিয়ে তুলতে হয়। আলো ও ছায়ার প্রতিফলন ভালো করে দেখলে বোঝা যায় একই গাছের পাতার সবুজ রং রোদে যেমন উজ্জ্বল সবুজ, তেমনি সেই গাছের পাতা ছায়াতে গিয়ে অন্যরকম সবুজ হলেও সবুজের উজ্জ্বলতা হারাবে না।

সূর্যের কারণে যেমন আমরা দিন-রাত্রি পাই, তেমনি একই কারণে আলোছায়ার ব্যাপার ঘটে। সূর্যের আলো যেদিকে থাকে তার উল্টো দিকে ছায়া ও অন্ধকার থাকা স্বাভাবিক। প্রকৃতিতে এই রূপের আবার পরিবর্তন ঘটে। যেমন সকালে একরকম আলোছায়া, দুপুরে আরো বেশি আলোছায়া, বিকেলে নরম রোদ, ছায়াও নরম হয়। সন্ধ্যাবেলায় সূর্য ডুবে যায়। তাই অন্ধকার। তাই আলোছায়াকে মোটামুটি তিন স্তরে ভাগ করে নিলে ছবি আঁকার সুবিধা হয়।

এভাবে শিশুরা বড় হওয়ার সাথে সাথে ছবি আঁকার সাধারণ নিয়মগুলো– যা তারা নিজেরা বুঝতে পারে তা পালন করবে। শিক্ষক ও অভিভাবকেরা শিশুর বয়স বিবেচনা করে শুদ্ধ ও সুন্দরভাবে আঁকার সাধারণ নিয়মগুলো যথাসম্ভব সহজ করে বুঝিয়ে দেবেন। নিয়ম বুঝে নিয়ে ছোটরা নিজেরাই আঁকবে– সহজভাবে আঁকবে, ইচ্ছেমতো আঁকবে। ছবি আঁকা একটি মজার খেলা, সুন্দর কাজ। আর সুন্দর কিছু করা আনন্দের, শিশু নিজে-নিজেই তা করতে পারছে– এ বিষয়টি গুরুত্ব দিতে হয়।

ছবিতে বিষয় সাজানো

ছবির বিষয় যদি হয় গ্রামের কোনো বাড়ি, বাড়িতে যদি তিনটি ঘর থাকে, গাছপালা থাকে, উঠোন থাকে, মানুষ, হাঁস-মুরগি ইত্যাদিও থাকতে পারে। এতগুলো জিনিস ছবির কাগজে কোনটা কোথায় আঁকলে ছবিটা সুন্দর একটি গ্রামের বাড়ির ছবি হিসাবে দাঁড়াবে তা সুন্দরভাবে সাজিয়ে আঁকাই হল বিষয় সাজানো। এটা শুধু গ্রামের বাড়ির ছবি আঁকার জন্যে নয়, যে কোনো ছবি– গ্রামের দৃশ্য, পশু, পাখি, একজন মানুষ, শুধু মানুষের মুখের ছবি, ফুলের ছবি, সব ছবিই আঁকার শুরুতে কাগজে যথাযথ সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিতে হয়। আঁকার বিষয়টি চার-পাঁচ রকম ভাবে সাজিয়ে দেখে নিলে ভালো। যেটা নিজের কাছে সবচেয়ে সুন্দর মনে হবে, সেটাই ড্রইং করে রং ও আলোছায়া এঁকে দেখতে হয়।

ছবিতে যেখানে আলো, তার পাশেই অল্প আলো এবং পরে ছায়া ও বেশি ছায়া ইত্যাদি ভালোভাবে দেখতে হয়– সঠিকভাবে আঁকতে হয়। রোদে, ছায়ায় যে তফাৎ ঘটে তা ভালোভাবে দেখে নিতে হয়।

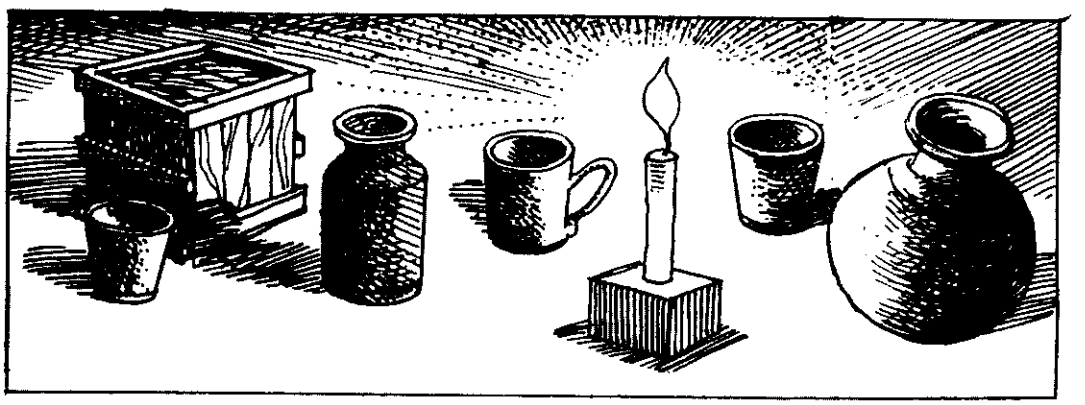

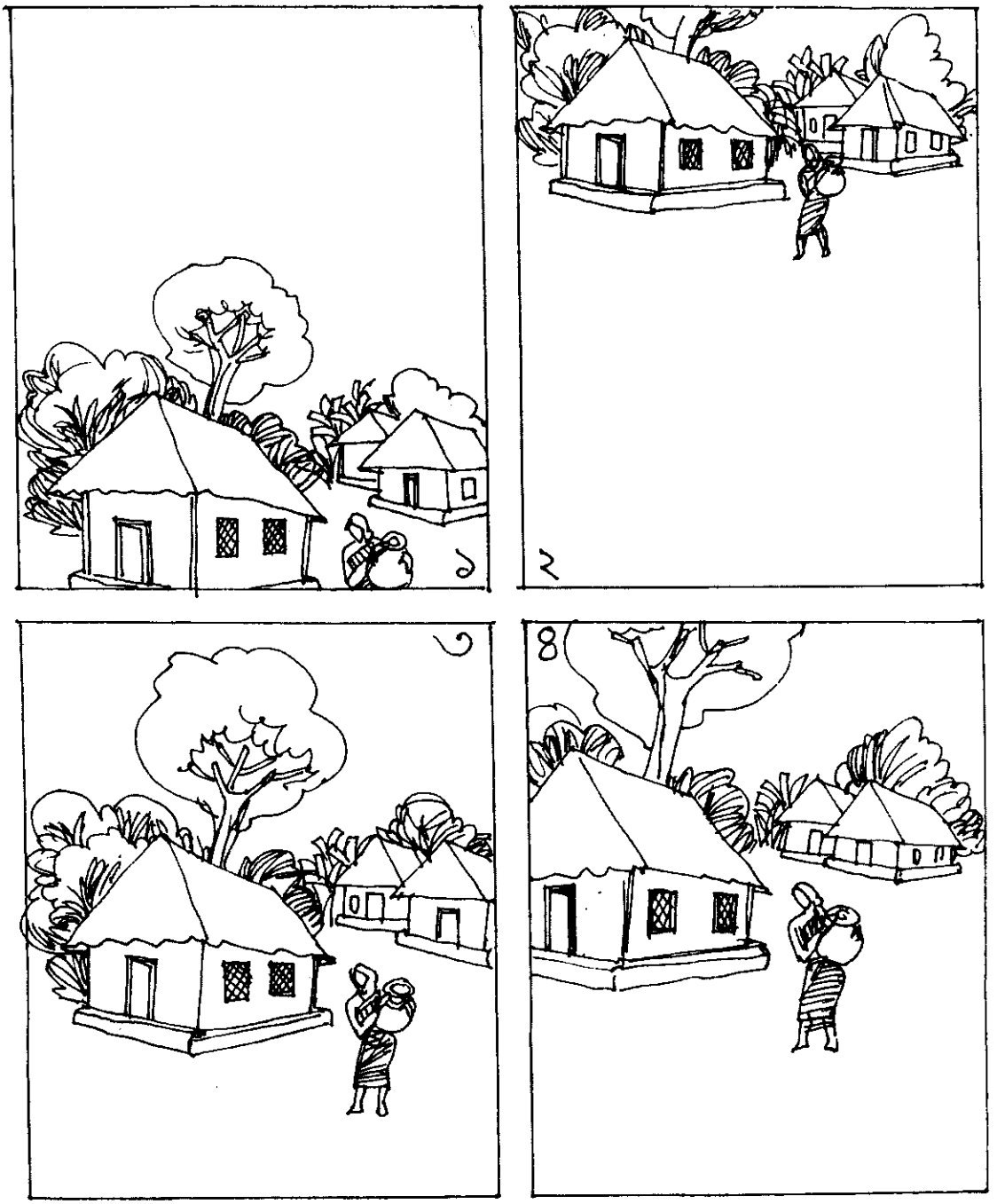

ছবির বিষয় এক। কিন্তু চার রকমভাবে সাজানো হয়েছে। এর মধ্যে যেটি বেশি সুন্দর সেটি আঁকতে হয়। এখানে ৩নং ছবিটি কি বেশি সুন্দর?

রঙের ব্যবহার

শুধু বই পড়ে রঙের ব্যবহার ভালোভাবে শেখা যাবে এমন কথা বলা মুশকিল। কারণ, ছবি আঁকা হাতেকলমে শেখার কাজ। বার বার ছবি এঁকে নানা রকম রং লাগিয়ে বিভিন্ন রকম রঙের ব্যবহার রপ্ত করে নিতে হয়। আঁকার শুরুতে অবশ্যই শিল্পকলা শিক্ষকের কাছ থেকে হাতেকলমে রং কত রকম ভাবে ব্যবহার করা যায় তা জেনে নিলে ভালো। শিক্ষক জলরং, প্যাস্টেল রং, পোস্টার রং, রঙিন সিগ্‌নেচার কলম– প্রত্যেকটি মাধ্যমে নিজে ছবি এঁকে রঙের সঠিক ব্যবহার পদ্ধতি ও নিয়মকানুন ছাত্রদের শিখিয়ে দেবেন। কোনো বিশেষ ছবি কোন কাজে ভালো হয় তাও যোগাড় করে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। শিশুরা নিজেরাও কয়েক বার ছবি এঁকে, নানা রকম রং নিয়ে বার বার এঁকে বিষয়টি রপ্ত করতে পারে।

প্রাথমিক রং ও মাধ্যমিক রং সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হয়।

প্রাথমিক রং - হলুদ, লাল ও নীল।

মাধ্যমিক রং - হলুদ + লাল = কমলা।

হলুদ + নীল = সবুজ।

নীল + লাল = বেগুনি।

প্রাথমিক রং ও মাধ্যমিক রং একটি আরেকটির সাথে মিশিয়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় রং তৈরি করা যায়। তবে একদম সাদা রং ও কালো রঙের ব্যবহার অন্য রং মিশিয়ে সম্ভব নয়। কালোর কাছাকাছি গাঢ় করা কিছুটা সম্ভব।

জলরং

পানির সাথে রং মিশিয়ে যে ছবি আঁকা হয় তাকে বলা হয় জলরং। জলরং রঙের বাক্সে ছোট ছোট খোপে চারকোনা ট্যাবলেটের মতো থাকে। আলাদা ট্যাবলেট অবস্থায়ও পাওয়া যায়। তবে টিউবের মধ্যে পেস্টের (টুথপেস্ট) মতো অবস্থায়ও জলরং তৈরি হয়ে থাকে। এই রং ব্যবহার করতে অনেক সুবিধা। পোস্টার রং নামে এক রকম নরম রং অনেকটা জলরং পেস্টের মতো কাচের শিশিতে পাওয়া যায়। এই রং পানিতে মিশিয়ে ছবি আঁকা যায়। জলরং ও পোস্টার রং কাছাকাছি হলেও গুণগত দিক থেকে খানিকটা ভিন্ন। জলরং স্বচ্ছ ও পাতলা। একটি রঙের ওপর আরেকটি রং হয়। পোস্টার রং ভারী বা মোটা। জলরং ও পোস্টার রং সাধারণত কাগজের ওপর ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জলরঙে ছবি আঁকার জন্যে একটু মোটা ও খসখসে জমিনের কাগজ সবচেয়ে উপযোগী। আমাদের দেশে

যে মোটা কার্টিজ কাগজ পাওয়া যায় তাতে আঁকা যেতে পারে। 'হ্যান্ডমেড' কাগজ বা উন্নত ধরনের কাগজ যোগাড় করে জলরঙে ছবি আঁকা যায়।

প্যাস্টেল রং

রঙের কাঠি। মোমক্রেওন, তেল-প্যাস্টেল ও চক-প্যাস্টেল। রঙের কাঠি ঘষে ঘষে কাগজে লাগাতে হয়। এর জন্যে পানি, তেল বা আঠা মেশাবার প্রয়োজন হয় না। তবে চক-প্যাস্টেল যেহেতু খুব নরম ও রঙের পাউডার আঁকার পরে ছবি নাড়াচাড়ার কারণে ঝরে যেতে পারে বা মুছে যেতে পারে সে জন্যে তরল ফিক্সেটিভ স্প্রে করে রঙকে স্থায়ী করে নিতে হয়। একইভাবে চারকোল বা কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা ছবিও স্প্রে করে স্থায়ী করে নিরে ছবি অনেক দিন পর্যন্ত সুন্দর থাকে। এই তরল ফিক্সেটিভ শিশির মধ্যে রঙের দোকানে পাওয়া যায়। তেল-প্যাস্টেল রঙে সহজ ও সুন্দরভাবে ছবি আঁকা সম্ভব।

তেলরং

তেলরং সাধারণত পেস্ট হিসেবে টিউবের ভেতরে পাওয়া যায়। এই রং তারপিন এবং তিসি তেলে মিশিয়ে ছবি আঁকতে হয়। মোটা কাপড়ের ক্যানভাসে, হার্ডবোর্ডে ও কাঠে এই তেলরং ছবি আঁকা হয়। তেলরং ছবির জন্যে বিশেষ ধরনের কাগজ তৈরি হয়ে থাকে। তবে কাপড়ের ক্যানভাস হচ্ছে তৈলচিত্রের জন্যে সবচেয়ে উপযোগী। শিশুদের মধ্যে যারা বড় এবং যারা জলরং ও প্যাস্টেলে ছবি আঁকা রপ্ত করেছে বা অষ্টম শ্রেণির পর এ মাধ্যমে ছবি আঁকলে ভালো হয়। কারণ এ মাধ্যমে ছবি আঁকতে হবে প্রচুর পরিশ্রম প্রয়োজন।

যেহেতু ছবি আঁকা বিষয়টি হাতেকলমে শেখার জন্যে বার বার অভ্যাস করতে হয়, সেহেতু অনেক ছবি আঁকতে হয়। একটি দু'টি ছবি আঁকলে ছবি আঁকা ভালোভাবে শেখা বা জানা যায় না। ছবি আঁকার সহজ নিয়মগুলো ছাত্র-ছাত্রীরা ভালোভাবে বুঝে নেবে। শিশুরা যাতে ছবি আঁকায় আনন্দ পায় এবং উৎসাহিত হয় সেদিকে শিক্ষক ও অভিভাবকগণ বিশেষ যত্নবান হবেন।

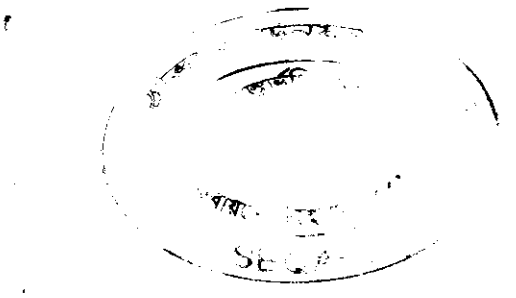

প্রাথমিক রং = হলুদ, লাল, নীল। মাধ্যমিক রং = কমলা, সবুজ ও বেগুনি।

হলুদ

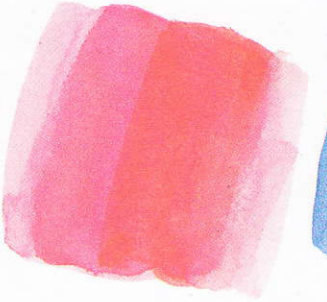

লাল

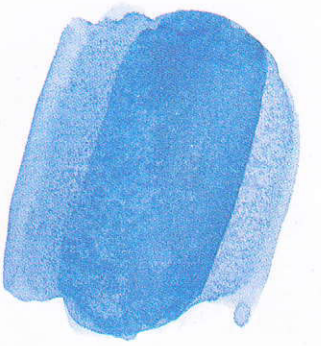

নীল

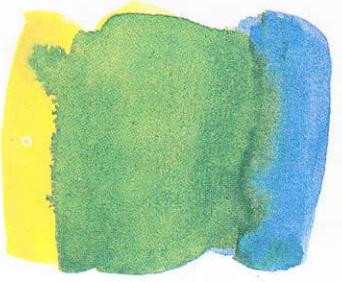

হলুদ+নীল= সবুজ

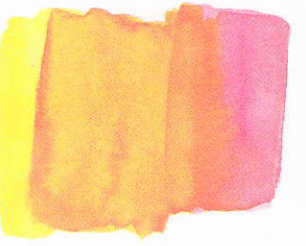

হলুদ+লাল= কমলা

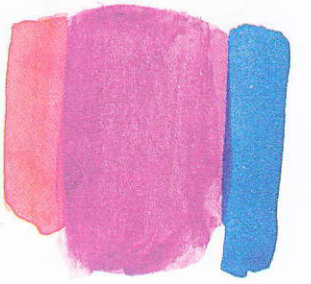

লাল+নীল= বেগুনি

রঙিন প্যাস্টেলে আঁকা

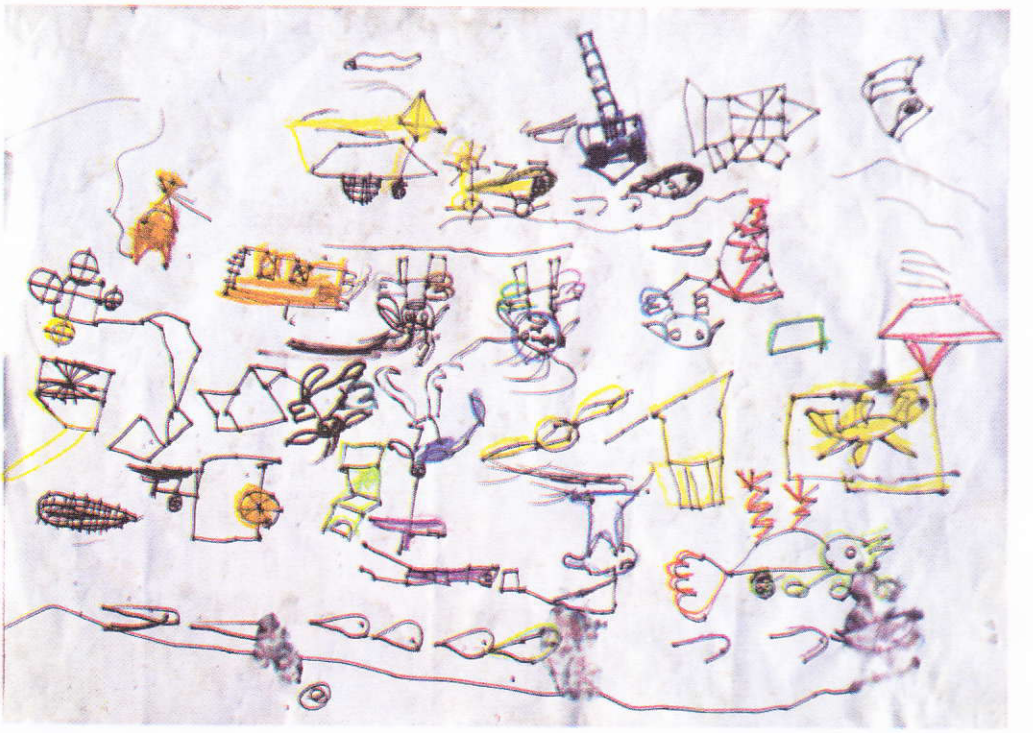

খেলার সাথিরা, কলমে এঁকেছে সৌহার্দ চক্রবর্তী, বয়স ৪, ২০১১

খেলা, পোস্টার রং-এ এঁকেছে : ফারহান আমিন, বয়স ৪, ২০০৬

এক সাথে হাঁটি, প্যাস্টেল ও পেন্সিলে আঁকা- অদিত্রি আমিন, বয়স ৫, ২০০৯

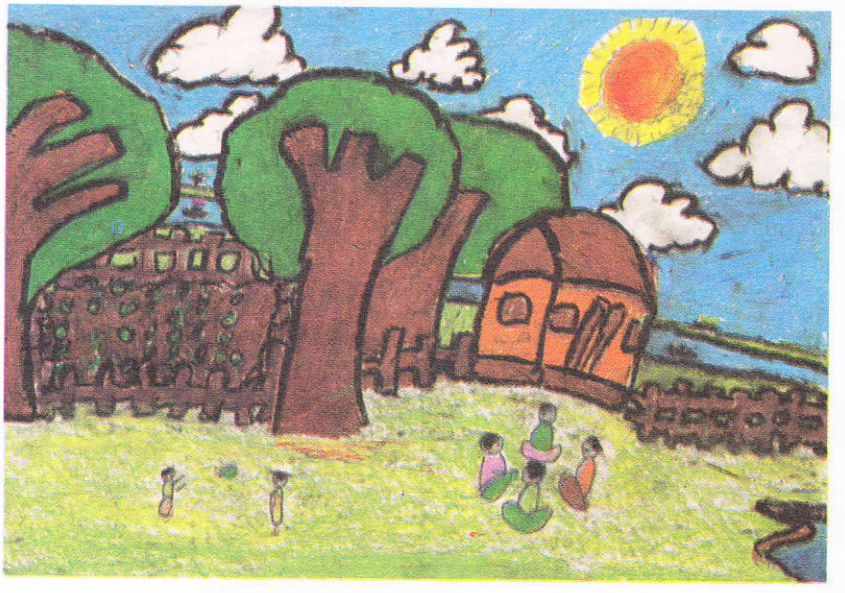

গ্রাম, প্যাস্টেলে এঁকেছে- রেদওয়ান আহমেদ কিরণ, বয়স ৬, ২০০৭

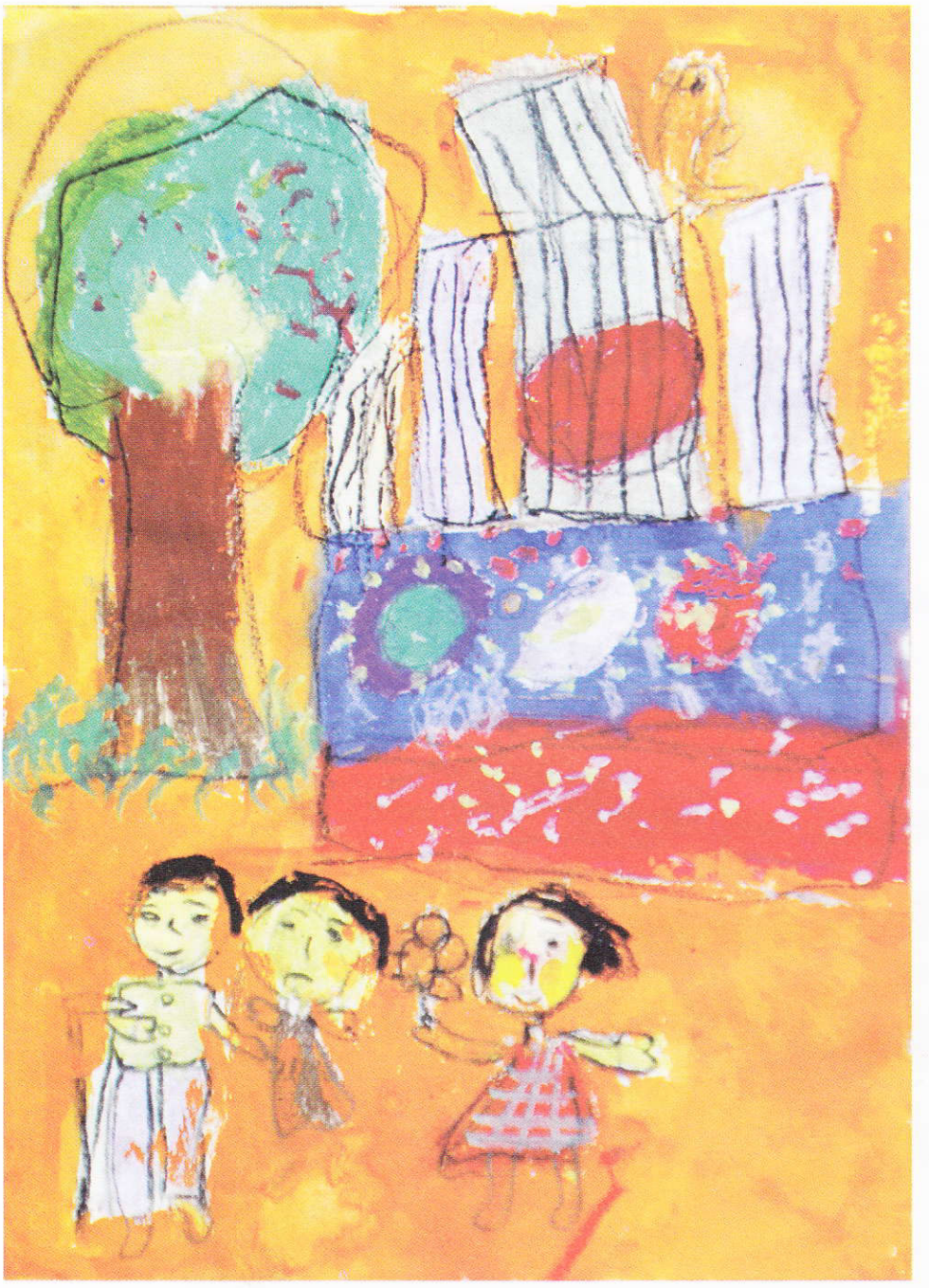

শহীদ মিনার, জলরঙ ও প্যাস্টেলে আঁকা; এঁকেছে- আজমিতা সালওয়া, বয়স ৫, ২০১২

স্বাধীনতা দিবস, প্যাস্টেল ও জলরঙে এঁকেছে- আজরা মাইসা আমিন, বয়স ৬, ২০০৬

অনুষ্ঠান, একরঙে এঁকেছে- গালিব মুবাশির, বয়স ৮, ২০০৬

খেলা, রঙিন কলমে এঁকেছে- তাহামা মরিয়াম হায়াৎ, বয়স ৯, ২০১১

শহীদ মিনার, জলরঙে এঁকেছে- ম: কাইফ ফয়সল আল গফুর, বয়স ৫, ২০০৯

হাতি, জলরঙে এঁকেছে- তাবাসসুম সিনথিয়া, বয়স ৬, ২০১২

পাকাধান, পোস্টার রঙে এঁকেছে- ফাইরুজ হাসান লাবিবা, রুম ১১, ২০১১

খেলা, জলরং ও প্যাস্টেলে এঁকেছে- নজরানা রশীদ, বয়স ৭, ২০১১

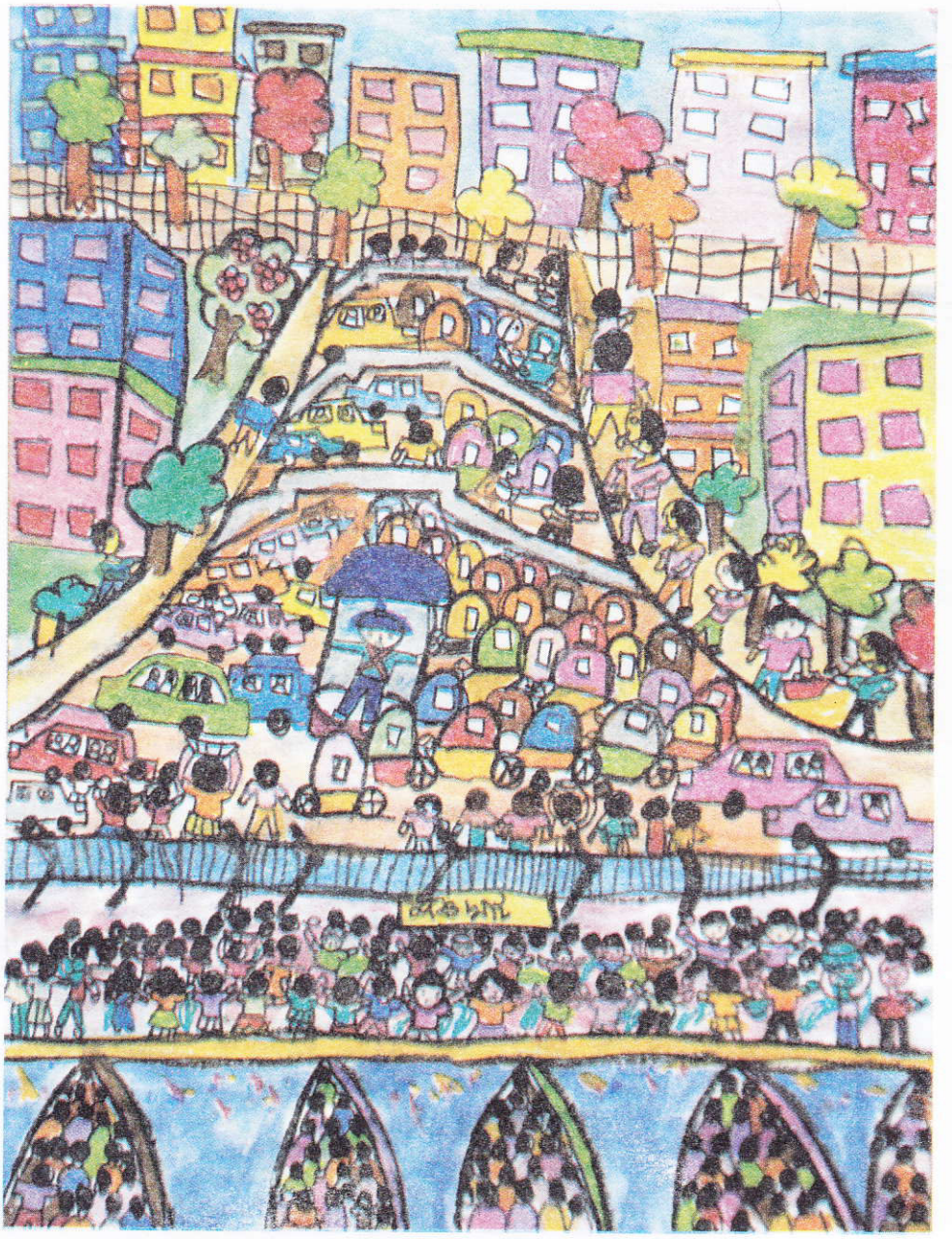

ঢাকা, জলরং ও ড্রইং, এঁকেছে- নবনিতা হালদার, বয়স ৭, ২০১১

বস্তি ও রেলগাড়ি, জলরং ছবি এঁকেছে- অমিত সূত্রধর, বয়স ১২, ২০০৯

জলরং ছবি এঁকেছে- মাসুর মুরাব্বাত খান প্রত্যয়, বয়স ৫, ২০১১

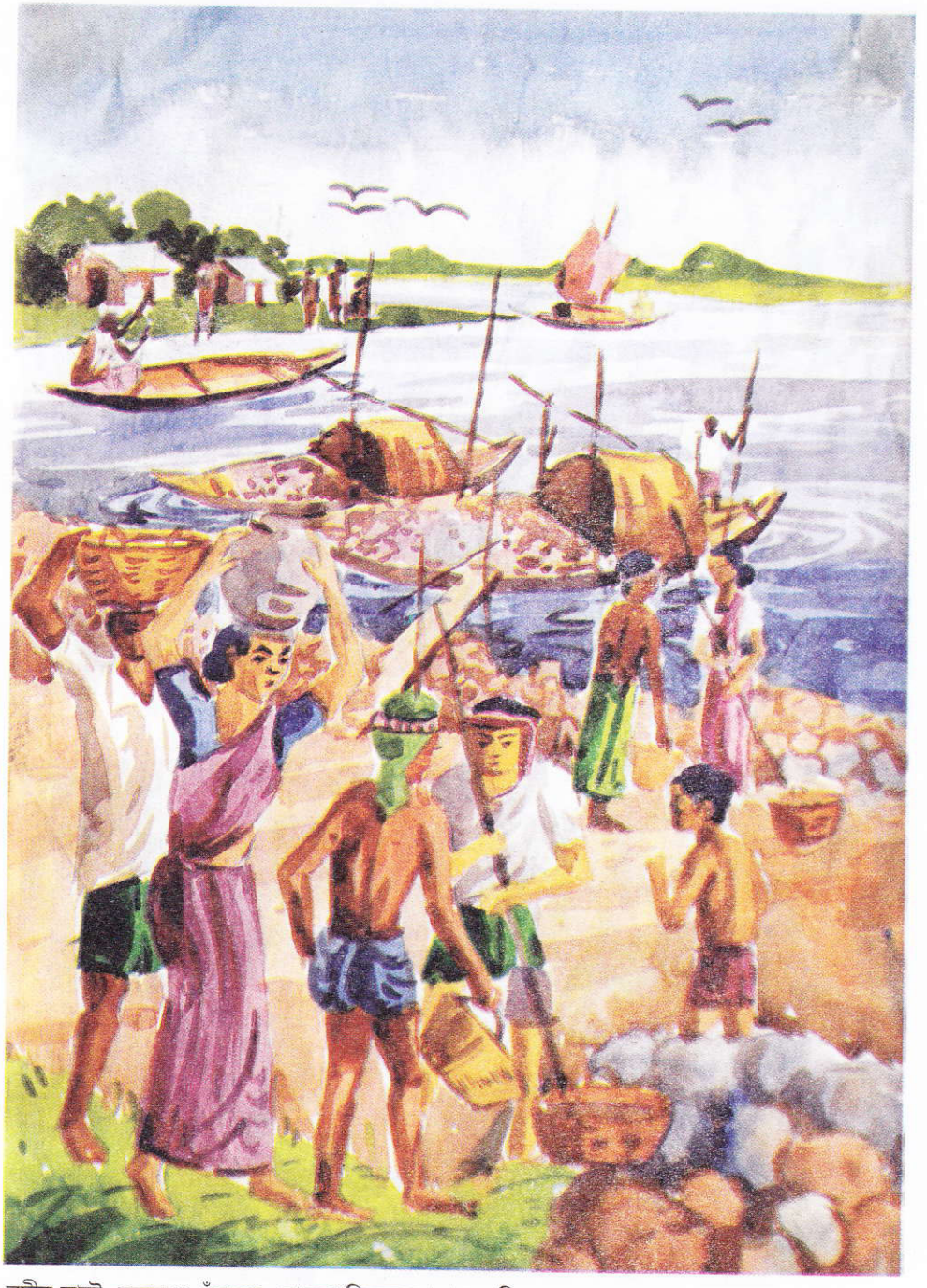

নদীর ঘাটে, জলরঙে এঁকেছে- আসমা বিনতে জালাল কলি, বয়স ১৩, ২০০৯

নবান্ন, জলরঙে এঁকেছে- কাজী মালিহা তাহসিন, বয়স ১১, ২০১১

মুক্তিযুদ্ধ, জলরঙে এঁকেছে- জান্নাতুল ফেরদৌস প্রমী, বয়স ১৩, ২০০৬

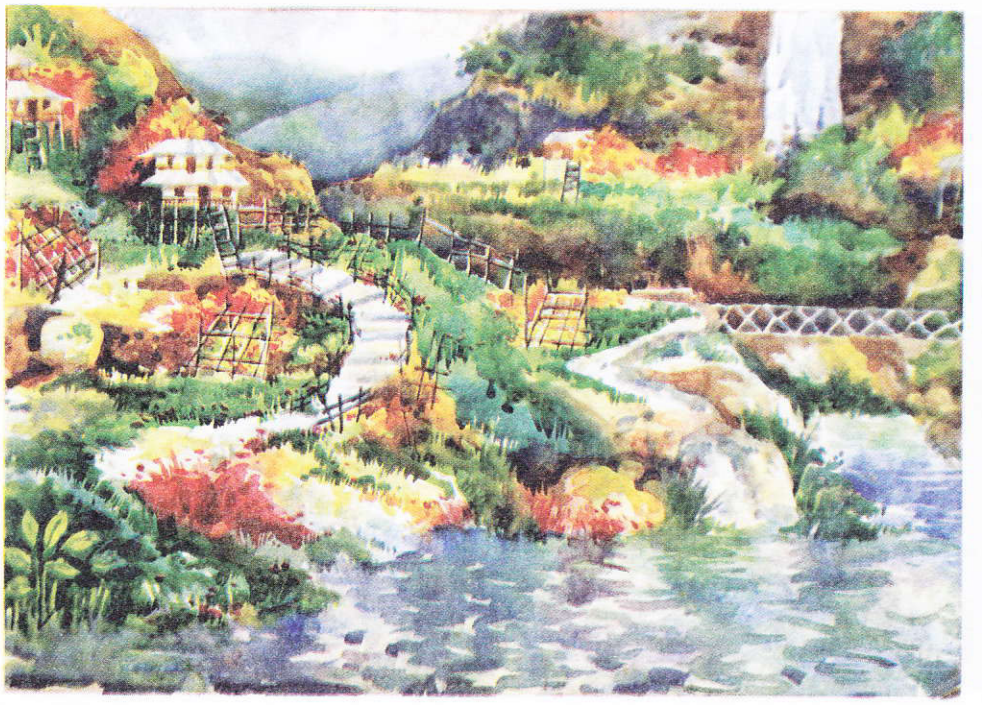

রাঙামাটি, জলরঙে এঁকেছে- নাবিলা নওশিন, বয়স ১৬, ২০০৬

মন্দির, জলরঙে এঁকেছে- অনন্য মেহপার আজাদ, বয়স ১৪, ২০০৬

শহীদ মিনারে, জলরঙে এঁকেছে- তাওরিম রাহুল সিংগহা, বয়স ১২, ২০০৯

পাহাড়ি গ্রাম, জলরঙে এঁকেছে- মঙ কিয়াও সিং মারিমা, বয়স ১৫, ২০০৯

গ্রাম, রঙিন কাগজ কেটে ছবি- জোহানা আরুশা নইম, বয়স ১৭, ২০১১

নদী, জলরঙে এঁকেছে- সুমন কর্মকার, বয়স ১৬, ২০০৬

পাহাড়ি ঝরনা, জলরঙে এঁকেছে- জাইমা জাহিন নিধি, বয়স ১৭, ২০১১

পার্বত্যাঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচি
অন্তর্ভুক্তি

ছবি আঁকা ছবি লেখা

হাশেম খান

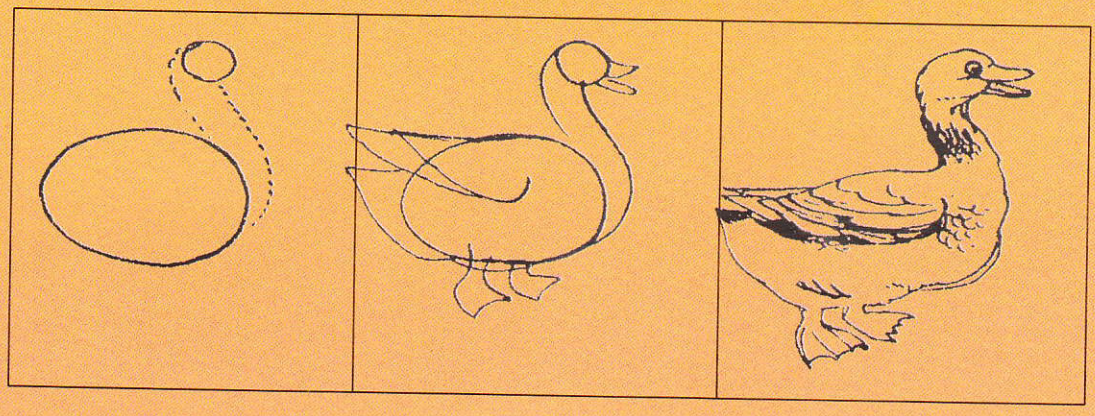

বইটি শিশু-কিশোরদের জন্যে লেখা, তবে বড়রা অর্থাৎ বাবা-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, কাকা-কাকি, মামা-মামি, বড়ভাই, মেজোভাই ও বোনেরা এবং শিক্ষক-অভিভাবকেরা সবাই এটি পড়তে পারেন এবং জেনে নিতে পারেন শিশু-কিশোরদের ছবি আঁকার জন্য কী করতে হয় আর কীভাবে ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকায় সহযোগিতা করা যায়। এই বই পড়ে শিশু-কিশোরেরাও বুঝতে পারবে কেমন ছবি তারা আঁকে এবং কত সহজে ছবি আঁকা যায়।

মা-বাবা এবং বড়রাও যে কোনো বয়স থেকে ছবি আঁকা শুরু করতে পারেন। কারণ ছবি আঁকা অর্থাৎ সাদা কাগজে বা ক্যানভাসে লাল নীল হলুদ সবুজ রং নানা রকম আঁকিবুকি দিয়ে ভরাট করে একটা কিছু তৈরি করতে পারাটা সবার জন্যেই আনন্দের।

ISBN : 984-70076-0729-7
মূল্য : ৯১.০০

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP) এর পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য মুদ্রিত।

বিক্রির জন্য নয়